Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবতের ভয়াবহতা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাদিয়া আকতার

রোলঃ 23100121174

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবতের ভয়াবহতা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাদিয়া আকতার

রোলঃ 23100121174

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " গীবতের ভয়াবহতা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাদিয়া আকতার, আইডিঃ 23100121174 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ গীবতের ভয়াবহতা ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Sadia

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সাদিয়া আকতার

আইডিঃ 23100121174

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা......5
গীবত কেনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়:......5
ইসলামে নৈতিকতা ও চরিত্রের গুরুত্ব :......7
সমাজে গীবতের প্রভাব :......8
থিসিসের উদ্দেশ্য : গীবত বোঝানো, এর ভয়াবহতা ও প্রতিকার নির্দেশ করা :......9
গীবতের সংজ্ঞা......10
গীবত করা ব্যভিচার থেকে জঘন্য :......13
গীবত হলো সমস্ত অনিষ্টের উৎস:......14
গীবত ও অপবাদের মধ্যে পার্থক্য :......15
সরাসরি ,ইশারা বা লেখভিত্তিক গীবত:......17
কুরআনের আলোকে গীবত:......18
হাদীসের আলোকে গীবত:......20
গীবতের কারণ......22
গীবতের ক্ষতিকর প্রভাব......24
আধুনিক সমাজে গীবত......26
গীবত কখন করা জায়েয:......28
গীবত থেকে বাঁচার উপায়......34
উপসংহার:......44

ভূমিকা

০ ইমাম নববি রহ: জবান সম্পর্কিত গুনাহ সমূহের একটি তালিকা করেছেন । সেই তালিকার মাঝে তিনি সর্বপ্রথম গীবতের কথা উল্লেখ করেছেন । কেননা জবান সম্পর্কিত গুনাহের মধ্যে এটির ব্যাপকতা সবচেয়ে বেশি । এটি এমন একটি ব্যাধি ; যা আমাদের প্রতিটি আসরে,প্রতিটি মজলিসে ,সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছে । কোনো আড্ডা আজ এই গীবত থেকে মুক্তি নয়।কোনো আলাপ চারিতা আজ গীবতের জঞ্জাল থেকে পবিত্র নয়।অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই গীবত সম্পর্কে কঠোর শাস্তির ধমকি দিয়েছেন ।কুরআনুল কারিমে গীবত সম্পর্কে মহান আল্লাহ যে কঠিন শব্দ ব্যবহার করেছেন অন্য কোনো গুনাহের ক্ষেত্রে ততটা রুক্ষ ভাষা ব্যবহার করেন নি।

গীবত কেনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়:

গীবত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়। এটি শুধু একটি ব্যক্তিগত গুনাহ নয়; বরং মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক শান্তি এবং আখিরাত—সবকিছুর উপর এর ভয়াবহ প্রভাব পড়ে। সমাজে অনেক মানুষ গীবতকে খুব সাধারণ বিষয় মনে করে। কেউ এটিকে ছোট গুনাহ মনে করে, আবার কেউ গুনাহ হিসেবেই গণ্য করে না। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে গীবত অত্যন্ত জঘন্য ও মারাত্মক অপরাধ। কুরআন ও হাদীস গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে গীবতের ভয়াবহতা, এর ক্ষতিকর প্রভাব এবং কঠিন পরিণতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।
ইসলাম মানুষকে **“আশরাফুল মাখলুকাত”** বা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে মর্যাদা দিয়েছে। মানুষের সম্মান, ইজ্জত ও ব্যক্তিত্বকে ইসলাম অত্যন্ত মূল্যবান বলে গণ্য করেছে। একজন মুসলমানের জান, মাল ও সম্মান অন্য মুসলমানের জন্য পবিত্র ও নিরাপদ। কিন্তু গীবতের মাধ্যমে একজন মানুষের সম্মান ক্ষুণ্ন করা হয়, তার ব্যক্তিত্বকে ছোট করা হয় এবং সমাজে তার মর্যাদা নষ্ট করা হয়। এ কারণে গীবত শুধু মুখের একটি পাপ নয়; বরং এটি মানুষের অধিকার নষ্ট করারও একটি মাধ্যম।

গীবতের কারণে মানুষের মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা ও সম্পর্কের অবনতি সৃষ্টি হয়। অনেক সময় একটি ছোট গীবত পরিবার ভেঙে দিতে পারে, বন্ধুত্ব নষ্ট করতে পারে এবং সমাজে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে। বর্তমান সমাজে আড্ডা, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, আত্মীয়-স্বজনের আলোচনা কিংবা অবসর সময়ের কথাবার্তায় গীবত এত বেশি ছড়িয়ে পড়েছে যে মানুষ অনেক সময় বুঝতেই পারে না যে সে বড় একটি গুনাহে লিপ্ত হচ্ছে। ফলে ধীরে ধীরে গীবত সমাজে স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হচ্ছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

গীবতের সবচেয়ে ভয়াবহ দিক হলো এটি আখিরাতকে ধ্বংস করে দেয়। একজন ব্যক্তি হয়তো নামাজ, রোজা, দান-সদকা ইত্যাদি অনেক নেক আমল করে; কিন্তু গীবতের কারণে তার নেকিগুলো অন্যের আমলনামায় চলে যেতে পারে। হাদীসে এসেছে, কিয়ামতের দিন এমন অনেক ব্যক্তি থাকবে যারা ইবাদত নিয়ে আসবে, কিন্তু মানুষের হক নষ্ট করার কারণে শেষ পর্যন্ত নিঃস্ব হয়ে যাবে। তাই গীবতকে শুধু সাধারণ মুখের দোষ মনে করলে চলবে না; বরং এটিকে ঈমান ও আখিরাতের জন্য মারাত্মক হুমকি হিসেবে দেখতে হবে।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তায়ালা গীবতকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার মতো জঘন্য কাজের সাথে তুলনা করেছেন। এই উপমা থেকেই বোঝা যায়, ইসলামে গীবত কতটা ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় অপরাধ। মহান আল্লাহ বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

অর্থ : "হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিক ধারণা (সন্দেহ) থেকে দূরে থাকো। নিশ্চয় কিছু সন্দেহ পাপ। আর তোমরা একে অপরের গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি পছন্দ করবে যে সে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাবে? নিশ্চয় তোমরা তা অপছন্দ করো। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু।"

(সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯:১২)

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তিনটি কাজ নিষেধ করেছেন ।সেগুলো হলো

(১) বেশি বেশি অনুমান করা

(২) অপরের দোষ খুঁজে বেড়ানো

(৩) গীবত করা ।

অর্থাৎ মানুষ যেমন মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়াকে ঘৃণা করে, তেমনি একজন মুসলমানের উচিত গীবতকেও ঘৃণা করা। কারণ গীবত মানুষের সম্মানকে ধ্বংস করে এবং সমাজে পারস্পরিক ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ নষ্ট করে দেয়।
তাই গীবতের মতো মারাত্মক গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য প্রত্যেক মুসলমানের উচিত গীবত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা, এর ক্ষতিকর দিকগুলো উপলব্ধি করা এবং নিজের কথা ও আচরণের ব্যাপারে সতর্ক থাকা। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে শান্তিপূর্ণ রাখতে এবং আখিরাতে মুক্তি লাভ করতে গীবত থেকে বেঁচে থাকা অত্যন্ত জরুরি।

ইসলামে নৈতিকতা ও চরিত্রের গুরুত্ব :

ইসলামে নৈতিকতা ও উত্তম চরিত্রের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ইসলাম শুধু ইবাদতের ধর্ম নয়; বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানুষকে সুন্দর আচার-আচরণ, সততা, নম্রতা, দয়া, সহনশীলতা ও পারস্পরিক সম্মানবোধ শিক্ষা দেয়। ইসলাম মানুষকে একে অপরের সাথে ভালো ব্যবহার করতে এবং হিংসা, অহংকার, গীবত, মিথ্যা ও খারাপ আচরণ থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছে।
উত্তম চরিত্র একজন মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ। সুন্দর আচরণের মাধ্যমে মানুষ সমাজে সম্মান ও ভালোবাসা লাভ করে। পরিবার ও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও নৈতিকতার গুরুত্ব অপরিসীম। এজন্যই মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাঁর চরিত্রের মাধ্যমে মানবজাতির জন্য সর্বোত্তম আদর্শ স্থাপন করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

অর্থ : "নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।"
(সূরা আল-কলম, ৬৮:৪)
হাদীসেও উত্তম চরিত্রের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—
"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যার চরিত্র উত্তম।"
(সহীহ মুসলিম)
এই হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, মানুষের প্রকৃত মর্যাদা তার ধন-সম্পদ বা বংশের মাধ্যমে নয়; বরং তার চরিত্র ও আচরণের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। উত্তম চরিত্র

সমাজে ভালোবাসা ও সৌহার্দ্য সৃষ্টি করে এবং মানুষের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ় করে।
বর্তমান সমাজে নৈতিক অবক্ষয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ইসলামের নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব আরও বেড়ে গেছে। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত ইসলামের শিক্ষা অনুসরণ করে নিজের চরিত্রকে সুন্দর ও পরিশুদ্ধ করা।

সমাজে গীবতের প্রভাব :

গীবতের ফলে সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধ ও পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হয়। মানুষে মানুষে যে ভালোবাসা, সম্মান ও সৌহার্দ্য থাকা উচিত, গীবত সেই সম্পর্ককে ধীরে ধীরে দুর্বল করে দেয়। একজনের উপস্থিতিতে যখন আরেকজনের নামে দোষ বর্ণনা করা হয়, তখন শ্রোতাদের মনে তার সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হয়। এর ফলে মানুষের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হয় ও তা পরবর্তীতে বড় ধরনের বিবাদের রূপ নেয়। গীবত সমাজে অশান্তি ও বিভেদের একটি বড় কারণ। যখন মানুষ বারবার অন্যের দোষ নিয়ে আলোচনা করে, তখন একে অপরের প্রতি বিশ্বাস কমে যায়। এতে মানুষ একে অপরের প্রতি আস্থা হারায় এবং সমাজের অস্থিরতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের মধ্যেও গীবতের কারণে ভুল বোঝাবুঝি ও দূরত্ব তৈরি হয়। অনেক সময় ছোট একটি গীবত বড় ঝগড়া বা সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার কারণ হয়ে যায়।
এছাড়া গীবতের কারণে সমাজে হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। মানুষ তখন একে অপরের দোষ খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা কমে যায়। ফলে সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়। তাই সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের জন্য গীবতের মতো খারাপ অভ্যাস থেকে দূরে থাকা অত্যন্ত জরুরি।

থিসিসের উদ্দেশ্য : গীবত বোঝানো, এর ভয়াবহতা ও প্রতিকার নির্দেশ করা :

এই থিসিসের মূল উদ্দেশ্য হলো গীবতের ভয়াবহতা সম্পর্কে মানুষকে জানানো, সচেতন করা এবং কিভাবে গীবত থেকে বেঁচে থাকা যায় তার উপায় নির্দেশ করা। বর্তমান সমাজে অনেক মানুষ গীবতকে সাধারণ বিষয় মনে করে প্রতিনিয়ত একে অপরের হক নষ্ট করে যাচ্ছে। তারা অনেক সময় বুঝতেই পারে না যে মুখের সামান্য কথার মাধ্যমেও বড় গুনাহ সংঘটিত হতে পারে। ফলে গীবত ধীরে ধীরে মানুষের স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হচ্ছে।

গীবতের কারণে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হয়, সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হয় এবং একজন মানুষের সম্মান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সবচেয়ে ভয়াবহ বিষয় হলো, এর কারণে মানুষের নেক আমলসমূহ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। একজন ব্যক্তি হয়তো অনেক ইবাদত-বন্দেগি করে, কিন্তু গীবতের মাধ্যমে অন্যের অধিকার নষ্ট করার কারণে তার আমল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই গীবতের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা অত্যন্ত জরুরি।

এই গবেষণার মাধ্যমে গীবতের এসব দিক স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হবে। পাশাপাশি গীবতের কারণ, এর ক্ষতিকর প্রভাব এবং সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে এর পরিণতি আলোচনা করা হবে। এছাড়াও মানুষ যেন নিজেদের কথা ও আচরণের ব্যাপারে সতর্ক হতে পারে এবং গীবতের মতো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারে, সে বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেওয়াও এই থিসিসের অন্যতম উদ্দেশ্য।

গীবতের সংজ্ঞা

গীবত কি: গীবত হলো কোনো মুসলমানের অনুপস্থিতিতে, তার অগোচরে তার সম্পর্কে এমন কোনো মন্তব্য করা বা এমন কোনো আলোচনা করা, যা সে যদি শুনতে পায় তাহলে অপছন্দ করবে। অর্থাৎ কারো দোষ, ত্রুটি বা অপছন্দনীয় বিষয় তার পেছনে আলোচনা করাই গীবত। এটি মুখের মাধ্যমে, ইশারায় বা অন্য যেকোনো উপায়েও হতে পারে। গীবত মানুষের সম্মান নষ্ট করে এবং পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে। ইসলামে এটি অনেক বড় গুনাহ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন :

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

অর্থ : "আর যারা কোনো অপরাধ ছাড়াই মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই এক মহা অপবাদ ও প্রকাশ্য গুনাহের বোঝা বহন করে।"

(সূরা আল-আহযাব, আয়াত ৫৮)

বিশেষজ্ঞ আলেমদের মতে গীবতের শরীয়ত সম্মত অর্থ :

মহানবী সা.-এর উপরোক্ত বাণীর আলোকে ইসলামের আলেমগণ গীবতের শরীয়ত সম্মত অর্থ করেছেন নিম্নরূপঃ

"কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে নিকৃষ্ট কথা সহকারে তার উল্লেখ করা।"

ইমাম গাযালী র. বলেনঃ

حَدُّ الْغِيبَةِ أَنْ تَذْكُرَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُهُ لَوْ بَلَغَه.ُ

অর্থ : গীবতের সংজ্ঞা হলোঃ তুমি তোমার ভাইয়ের উল্লেখ এমনভাবে করলে, যা তার কানে পৌঁছলে সে তা অপছন্দ করবে।"

হাদীসের প্রসিদ্ধ অভিধান 'আন-নিহায়া' গ্রন্থে ইবনুল আছীর গীবতের সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেনঃ

أَنْ تَذْكُرَ الْإِنْسَانَ بِغَيْبَةٍ يَسُوءُ وَ إِنْ كَانَ فِيه.ِ

অর্থ : কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার দুর্নাম করা-যদিও তার মধ্যে সেই দুর্নাম থেকে থাকে।"

ইমাম নবী র. গীবতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেনঃ

ذِكْرُ الْمَرْءِ بِمَا يَكْرَهُهُ- سَوَاءً ذَكَرْتَهُ بَاللَّفْظِ أَوْ بِالْإِشَارَةِ وَالرَّمْز.ِ

অর্থ : কোন ব্যক্তিকে এমনভাবে উল্লেখ করা, যা সে অপছন্দ করে-চাই তা প্রকাশ্যে করা হোক কিংবা ইশারা-ইঙ্গিতে।"

ইমাম-রাগিব আল-ইসফাহানী বলেনঃ

هِيَ أَنْ يَذْكُرَ الْإِنْسَانُ غَيْبَ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ مَوْجِبٍ إِلَى ذِكْرِ ذَلِك.َ

অর্থ : নিষ্প্রয়োজনে কোনো ব্যক্তির দোষ বর্ণনা করা হচ্ছে গীবত।"

সহীহ বুখারীর ভাষ্যকার আল্লামা বদরুদ্দীন-আইনী বলেনঃ

الْغِيبَةُ أَنْ يَتَكَلَّمْ خَلْفَ إِنْسَانٍ بِمَا يَغُمُّهُ لَوْ سَمِعَهُ وَكَانَ صِدْقًا أَمَّا إِذَا كَانَ كَذِبًا فَيُسَمَّى بُهْتَانًا.

অর্থ : গীবত হলো এই যে, কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন কথা বললো যা শুনলে সে চিন্তাগ্রস্ত হবে- এমন কি তা সত্য হলেও। অন্যথায় সে কথা মিথ্যা হলে তার নাম অপবাদ।"

ইবনুত-তাইন বলেনঃ

الْغِيبَةُ ذِكْرُ الْمَرْءِ بِمَا يَكْرَهُهُ بِظَهْرِ الْغَيْب.ِ

অর্থ : গীবতের অর্থ হচ্ছে- কোনো ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে এমনভাবে তার উল্লেখ করা, যা সে অপছন্দ করে।"

আল্লামা কিরমানী প্রদত্ত সংজ্ঞা হলোঃ

الْغِيبَةُ أَنْ تَتَكَلَّمْ خَلْفَ الْإِنْسَانِ بِمَا يَكْرَهُهُ لَوْ سَمِعَهُ، وَلَوْ كَانَ صِدْقًا.

অর্থ : গীবত এই যে, তুমি কোনো ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন কথা বলবে, যা শুনলে সে অপছন্দ করবে-যদিও তা সত্য হয়।"

আল্লামা ইবনে হাজার আল-আসকালানী গীবত ও চোগলখুরি সম্পর্কে বলেনঃ

الْغِيبَةُ تُوجَدُ فِي بَعْضِ صُوَرِ النَّمِيمَةِ وَهُوَ أَنْ تَذْكُرَهُ فِي غَيْبَةٍ بِمَا فِيهِ مِمَّا يَسُوءُهُ قَاصِدًا بِذَلِكَ الْإِفْسَادَ.

অর্থ : চোগলখুরির কোনো কোনো পর্যায়ের মধ্যে গীবতও পাওয়া যায়। তা হলো, কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার প্রকৃত দোষ বর্ণনা করা যা তার জন্য দুশ্চিন্তার কারণ হয়, আর এই বর্ণনার উদ্দেশ্য বিবাদ-বিসংবাদনার সৃষ্টি করা।"

অভিধান, হাদীস ও ফিকহের এসব ইমামগণের মধ্যে কেউই এই শরয়ী বিষয়ের যে সংজ্ঞা স্বয়ং শরীয়ত প্রণেতা প্রদান করেছেন তাকে অপূর্ণাঙ্গ ও ত্রুটিপূর্ণ সাব্যস্ত করে জবাবে নিজেদের প্রদত্ত সংজ্ঞা প্রদান করার দুঃসাহস করেননি। মূলত শরীয়ত প্রণেতাকে অতিক্রম করে শরীয়তের কোনো পরিভাষার তাৎপর্য বর্ণনার অধিকার কারও নেই। শরীয়ত প্রণেতা যখন একটি পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট পরিভাষা বাক্যে জবাব প্রদান করেছেন, তখন একজন মুসলমান হিসাবে আমাদের একথা মেনে নিতে হবে যে, এটাই তার সঠিক অর্থ। মুসলমান তো দূরের কথা একজন অমুসলিম ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিও এমন কথা বলার দুঃসাহস করতে পারে না যে, শরীয়ত প্রণেতার একটি পরিভাষার যে অর্থ ব্যক্ত করেছেন তা সঠিক নয়, বরং আমি যে অর্থ করেছি তা সঠিক। এটা এমন একটি অযৌক্তিক কথা, যেমন একটি আইন পরিষদ তাদের প্রণীত আইনের

কোনো পরিভাষার অর্থ বরং তারা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আর কোনো ব্যক্তি আইন বিশেষজ্ঞ হওয়ার দাবীদার বনে গিয়ে বললো যে, উল্লেখিত আইনের ঐ বিষয়ের আসল সংজ্ঞা তা নয় যা আইন পরিষদ বর্ণনা করেছে, বরং আমার প্রদত্ত সংজ্ঞাই সঠিক।

বর্তমান সমাজে অনেক মানুষ গীবতের প্রকৃত অর্থ না বোঝার কারণে সহজেই এ গুনাহে জড়িয়ে পড়ে। কিছু লোককে শোনা যায় তারা বলে, "আমি তো গীবত করছি না, এ কথা আমি তার মুখের উপর বলতে পারব।" তাদের এই যুক্তি দেওয়ার কারণ হলো, তারা মনে করে কোনো কথা সরাসরি বলার সাহস থাকলে তা গীবত হয় না। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ একথা তার সামনে বলুক আর নাই বলুক, তাকে কেন্দ্র করে বলা এমন কোনো কথা যা তাকে কষ্ট দিবে বা অপছন্দ হবে, তাই গীবত। অনেক সময় মানুষ হাসি-ঠাট্টা, সমালোচনা বা আড্ডার মাধ্যমে অন্যের দোষ আলোচনা করে থাকে এবং এটিকে সাধারণ বিষয় মনে করে। অথচ এসব কথাই একজন মানুষের সম্মান ক্ষুণ্ন করে এবং তার মনে কষ্টের সৃষ্টি করে। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত কথা বলার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা এবং অন্যের দোষ-ত্রুটি আলোচনা করা থেকে বিরত থাকা। কারণ গীবত শুধু একটি খারাপ অভ্যাস নয়; বরং এটি অনেক বড় গুনাহ, যা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর।

গীবত করা ব্যভিচার থেকে জঘন্য :

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে বিভিন্নভাবে গীবতের অনিষ্টের প্রকটতা বুঝিয়েছেন। তিনি এমনভাবে গীবতের ভয়াবহতা তুলে ধরেছেন, যাতে মানুষ এ গুনাহ থেকে সতর্ক হতে পারে এবং এর ক্ষতিকর দিক উপলব্ধি করতে পারে। সেগুলোকে আমাদের চোখের সামনে রাখতে হবে। তাহলে আমাদের মনেও গীবতের ভয়াবহ অনিষ্ট গেঁথে যাবে। মহান আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে গীবতের অনিষ্ট উপলব্ধি করার তাওফিক দান করুন এবং বাস্তবজীবনে গীবত পরিহার করার সুযোগ দান করুন।

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, গীবতের গুনাহ জিনার গুনাহের চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট। এই কথার মাধ্যমে গীবতের ভয়াবহতা কত বড়, তা

সহজেই বোঝা যায়। সাধারণত মানুষ ব্যভিচারকে অত্যন্ত বড় ও লজ্জাজনক গুনাহ হিসেবে মনে করে। কিন্তু গীবত সম্পর্কে মানুষ অনেক সময় এতটা সতর্ক থাকে না। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গীবতকে আরও ভয়াবহ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ না করুন, যদি কোনো ব্যক্তি জিনায় লিপ্ত হয়, তাহলে পরবর্তীতে যখন সে অনুতপ্ত হবে এবং অনুশোচনা বোধ করবে, তখন সে তাওবা করে নেবে। ইনশাআল্লাহ সে ক্ষমাও পেয়ে যাবে। কারণ এই গুনাহ মূলত বান্দা ও আল্লাহর মধ্যকার বিষয়। কিন্তু গীবতের বিষয়টি ভিন্ন। এখানে একজন মানুষের সম্মান নষ্ট করা হয়, তাকে অসম্মানিত করা হয় এবং তার হক ক্ষুণ্ন করা হয়।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির গীবত করা হলো, যাকে অসম্মানিত করা হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই ব্যক্তি ক্ষমা না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার মাফ নেই। অর্থাৎ শুধু আল্লাহর কাছে তাওবা করলেই যথেষ্ট নয়; বরং যার গীবত করা হয়েছে তার কাছ থেকেও ক্ষমা নিতে হবে। এ কারণেই গীবতের গুনাহ অত্যন্ত ভয়াবহ ও জটিল।

বর্তমান সমাজে মানুষ খুব সহজেই অন্যের দোষ আলোচনা করে, সমালোচনা করে এবং এটিকে সাধারণ বিষয় মনে করে। অথচ একটি গীবত একজন মানুষের সম্মান নষ্ট করতে পারে এবং আখিরাতে কঠিন শাস্তির কারণ হতে পারে। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত নিজের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং গীবতের মতো মারাত্মক গুনাহ থেকে সর্বদা সতর্ক থাকা।

গীবত হলো সমস্ত অনিষ্টের উৎস:

গীবত এতটাই ভয়ংকর, যা সমাজে অসংখ্য বিশৃঙ্খলা জন্ম দেয়। এই গীবতের কারণে ঝগড়া বেঁধে যায়। পরস্পরে অনৈক্য সৃষ্টি হয়। আজ আমাদের সমাজে যেই অরাজকতা পরিলক্ষিত হচ্ছে এর অন্যতম কারণ হলো, ওই গীবত। আজ যদি কোনো মদ পান করে তাহলে –আল্লাহ মাফ করুন– দীনের সঙ্গে যার সামান্যতম সম্পর্কও রয়েছে সে ওই মদপানকারীকে খারাপ চোখে দেখবে। তাকে মন্দ লোক ঠাওরাবে। তার সম্পর্কে এ ব্যক্তির মনে এ অনুভূতি জন্মাবে যে, লোকটি নেহায়েত মন্দ কাজ করছে। পক্ষান্তরে কোনো ব্যক্তি যদি গীবত করে তাহলে তার সম্পর্কে অন্যদের মনে এ ধরনের অনুভূতি

জন্মাবে না। গীবতকারীও এ কথা মনে করবে না যে, আমি কত বড় গুনাহ করেছি। কারণ গীবতের গুনাহের ভয়াবহতা তার অন্তরে নেই। অথচ গীবত কোনো অংশে জিনার চেয়ে কম নয়। এ দু'টোর মাঝে খুব বেশি পার্থক্য নেই। যদি আমরা জিনাকে খারাপ মনে করি তাহলে গীবতকেও খারাপ জ্ঞান করতে হবে। তাই আমাদের গীবত সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিজেদের অন্তরে গেঁথে নিতে হবে যে , এটি খুবই বিপজ্জনক ব্যাধি।

গীবত ও অপবাদের মধ্যে পার্থক্য :

হাদীস শরীফে এসেছে— একবার এক সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, গীবত কাকে বলে?" উত্তরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

ذِكْرُك أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ

অর্থ : "তোমার ভাই সম্পর্কে এমন কিছু বলা যা সে অপছন্দ করে।"

(সহিহ মুসলিম, হাদীস : ২৫৮৯)

অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন কথা বলা, যা সে শুনলে কষ্ট পাবে বা নেতিবাচকভাবে গ্রহণ করবে, সেটাই গীবত। মানুষ সাধারণত নিজের দোষ বা অপছন্দনীয় বিষয় অন্যের মুখে আলোচনা হোক তা পছন্দ করে না। তাই কারো অগোচরে তার ত্রুটি বা দোষ নিয়ে আলোচনা করা ইসলামের দৃষ্টিতে গীবত হিসেবে গণ্য হয়।

তখন ওই সাহাবী পুনরায় প্রশ্ন করলেন :

أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟

অর্থ : "আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে সত্যিই থাকে?"

তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : "যদি তা তার মধ্যে থাকে, তবে তুমি তার গীবত করলে। আর যদি তা তার মধ্যে না থাকে, তবে তুমি তার উপর অপবাদ আরোপ করলে।"

এই হাদীসের মাধ্যমে গীবত ও অপবাদের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। কোনো মানুষের মধ্যে বাস্তবেই যে দোষ আছে, সেটি তার অনুপস্থিতিতে আলোচনা করাই গীবত। আর যে দোষ তার মধ্যে নেই, এমন মিথ্যা অভিযোগ বা কথা তার নামে প্রচার

করা হলো অপবাদ। অর্থাৎ উভয়টিই গুনাহ, তবে অপবাদ আরও ভয়াবহ; কারণ এর মাধ্যমে একজন নির্দোষ মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা ছড়ানো হয়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের এসব বাণী থেকে প্রমাণিত হয়, কারো বিরুদ্ধে তার অনুপস্থিতিতে মিথ্যা অভিযোগ করাই অপবাদ আর তার সত্যিকার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা গীবত। এ কাজ স্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে করা হোক বা ইশারা ইঙ্গিতের মাধ্যমে করা হোক সর্বাবস্থায় তা হারাম। অনুরূপভাবে এ কাজ ব্যক্তির জীবদ্দশায় করা হোক বা মৃত্যুর পরে করা হোক উভয় অবস্থায় তা সমানভাবে হারাম। আবু দাউদের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে , মায়েয ইবনে মালেক আসলামীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপরাধে 'রজম' করার শাস্তি কার্যকর করার পর নবী সা. পথ চলতে চলতে শুনলেন, এক ব্যক্তি তার সঙ্গীকে বলছে ঃ এ লোকটার ব্যাপারটাই দেখো, আল্লাহ তার অপরাধ আড়াল করে দিয়েছিলেন। কিন্তু যতক্ষণ না তাকে কুকুরের মত হত্যা করা হয়েছে ততক্ষণ তার প্রবৃত্তি তার পিছু ছাড়েনি। সামনে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে একটি গাধার গলিত মৃতদেহ দৃষ্টিগোচর হলো। নবী করীম সা. সেখানে থেমে গেলেন এবং ঐ দু'ব্যক্তিকে ডেকে বললেন ঃ তোমরা দু'জন ওখানে গিয়ে গাধার ঐ গলিত মৃত দেহটা আহার করো।" তারা দু'জনে বললো ঃ হে আল্লাহর রসুল, কেউ কি তা খেতে পারে? নবী সা. বললেন ঃ

"তোমরা এইমাত্র তোমাদের ভাইয়ের সম্মান ও মর্যাদার ওপর যেভাবে আক্রমণ চালাচ্ছিলে তা গাধার এ মৃতদেহ খাওয়ার চেয়ে অনেক বেশি নোংরা কাজ।"

বর্তমান সমাজে অনেক মানুষ মনে করে সত্য কথা বললে গীবত হয় না। অথচ হাদীসের মাধ্যমে বোঝা যায়, কোনো কথা সত্য হলেও যদি তা কারো অনুপস্থিতিতে এমনভাবে বলা হয় যা সে অপছন্দ করবে, তাহলে সেটাই গীবত। তাই একজন মুসলমানের উচিত কথা বলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক থাকা।
কাজেই গীবত একটি সাংঘাতিক গুনাহ। প্রত্যেকের কর্তব্য হলো সে তার মুখ সামলে রাখবে এবং অন্যের দোষ-ত্রুটি আলোচনা করা থেকে বিরত থাকবে। পাশাপাশি আল্লাহ তাআলার কাছে এই গুনাহ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তৌফিক কামনা করবে।

সরাসরি ,ইশারা বা লেখভিত্তিক গীবত:

গীবত শুধু মুখে বলা কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং বিভিন্নভাবে গীবত হয়ে যেতে পারে। অনেক মানুষ মনে করে শুধুমাত্র কারো নামে সরাসরি খারাপ কথা বলাই গীবত। কিন্তু বাস্তবে কথা, আচরণ, ইশারা কিংবা লেখালেখির মাধ্যমেও গীবত সংঘটিত হয়। সাধারণত গীবত তিনভাবে হয়ে থাকে— সরাসরি কথার মাধ্যমে, ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমে অথবা লেখালেখির মাধ্যমে।

কোনো মানুষ যদি কারো অনুপস্থিতিতে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির নিকট তার নামে বলে যে, "অমুক খুব অহংকারী" বা "সে খুব বাজে ব্যবহার করে মানুষের সাথে", তাহলে এরকম বাক্য উচ্চারণ করা সরাসরি গীবতের অন্তর্ভুক্ত। কারণ এখানে একজন ব্যক্তির দোষ তার অনুপস্থিতিতে আলোচনা করা হচ্ছে, যা সে শুনলে কষ্ট পাবে। সমাজে আড্ডা, পারিবারিক আলোচনা কিংবা বন্ধুদের কথোপকথনের সময় এ ধরনের গীবত খুব বেশি হয়ে থাকে।

আবার কোনো ব্যক্তিকে সরাসরি কিছু না বলে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি, ইশারা, হাসাহাসি বা নকল করার মাধ্যমে কাউকে ছোট করলে তা হলো ইশারার মাধ্যমে গীবত। অনেক সময় মানুষ কারো চলাফেরা, কথা বলার ধরন বা আচরণ অনুকরণ করে অন্যদের হাসানোর চেষ্টা করে। এতে সেই ব্যক্তিকে অপমান করা হয় এবং তার সম্মান ক্ষুণ্ন হয়। যদিও এখানে সরাসরি কিছু বলা হয় না, তবুও এটি গীবতের অন্তর্ভুক্ত।

বর্তমানে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় লেখাভিত্তিক গীবত। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ফেসবুক, মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ, পোস্ট বা কমেন্টের মাধ্যমে অন্যের সমালোচনা করে মানুষ খুব সহজেই এই গুনাহে জড়িয়ে পড়ছে। অনেক সময় মানুষ কারো নাম উল্লেখ করে অথবা ইঙ্গিতপূর্ণ স্ট্যাটাস ও মন্তব্যের মাধ্যমে তাকে ছোট করার চেষ্টা করে। আবার কেউ কেউ অনলাইনে অন্যের দোষ নিয়ে আলোচনা করে, ব্যঙ্গাত্মক পোস্ট করে বা অপমানজনক মন্তব্য লিখে থাকে। এসবই লেখাভিত্তিক গীবতের অন্তর্ভুক্ত।

বর্তমান যুগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সহজলভ্য হওয়ার কারণে গীবতের পরিমাণ আরও বেড়ে গেছে। মানুষ সামান্য বিষয় নিয়েও অন্যের সমালোচনা করছে এবং বুঝতে পারছে না যে তারা একটি বড় গুনাহে জড়িয়ে পড়ছে। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত

শুধু মুখের কথার ব্যাপারেই নয়, নিজের আচরণ, ইশারা-ইঙ্গিত এবং লেখালেখির ক্ষেত্রেও সতর্ক থাকা, যাতে কোনোভাবেই গীবতের মতো গুনাহ সংঘটিত না হয়।

কুরআনের আলোকে গীবত:

কুরআনুল কারিমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বহু আয়াতে গীবত, নিন্দা, অপবাদ ও মানুষের সম্মানহানির ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। এসব আয়াতের মাধ্যমে বোঝা যায় যে ইসলাম মানুষের সম্মান ও মর্যাদাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে এবং কাউকে কষ্ট দেওয়া বা তার দোষ প্রচার করাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে।

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

অর্থ : "ধ্বংস ও দুর্ভোগ প্রত্যেক সেই ব্যক্তির জন্য, যে মানুষের নিন্দা করে ও দোষ খুঁজে বেড়ায়।"

(সূরা আল-হুমাযাহ : ০১)

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা মানুষের দোষ খুঁজে বেড়ানো এবং অন্যকে অপমান করার ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে "হুমাযাহ" ও "লুমাযাহ" দ্বারা এমন মানুষকে বোঝানো হয়েছে, যারা অন্যকে অপমান করে, পিছনে গীবত করে, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, ইশারা-ইঙ্গিতে কষ্ট দেয় বা মুখের কথায় আঘাত করে। কেউ সরাসরি খারাপ কথা বলে, আবার কেউ ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ বা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে অন্যকে ছোট করে। এসব আচরণ মানুষের সম্মান নষ্ট করে এবং সমাজে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে।
এই আয়াতের মাধ্যমে বোঝা যায়, শুধু মুখের কথায় নয়; বরং আচরণ, ইঙ্গিত কিংবা ব্যঙ্গের মাধ্যমেও মানুষ গুনাহে জড়িয়ে পড়তে পারে। বর্তমান সমাজে অনেক মানুষ অন্যের ভুল নিয়ে হাসাহাসি করে, সমালোচনা করে এবং এটিকে সাধারণ বিষয় মনে করে। অথচ আল্লাহ তাআলা এ ধরনের মানুষদের জন্য "ধ্বংস ও দুর্ভোগ"-এর সতর্কবার্তা দিয়েছেন। তাই একজন মুসলমানের উচিত অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ানো ও কাউকে অপমান করা থেকে নিজেকে বিরত রাখা।

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

অর্থ : "আর যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তার অনুসরণ করো না। নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তর— এদের প্রত্যেকটির সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"

(সূরা আল-ইসরা : আয়াত ৩৬)

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা শিক্ষা দিচ্ছেন— জানা ছাড়া কথা বলা, অভিযোগ করা, গুজব ছড়ানো, আন্দাজে সিদ্ধান্ত দেওয়া বা সাক্ষ্য দেওয়া নিষেধ। মানুষ অনেক সময় অন্যের সম্পর্কে না জেনে কথা বলে, শোনা কথাকে সত্য মনে করে প্রচার করে এবং যাচাই ছাড়াই সমালোচনা করে। এর ফলে গীবত, অপবাদ ও নানা ধরনের অন্যায় সমাজে ছড়িয়ে পড়ে।

এখানে আল্লাহ তাআলা মানুষকে সতর্ক করেছেন যে, মানুষের কান, চোখ ও অন্তর— সবকিছুর হিসাব নেওয়া হবে। মানুষ যা শুনে, যা দেখে এবং যা মনে ধারণ করে, সেসব বিষয়ে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তাই কোনো কথা শোনামাত্র তা প্রচার করা বা না জেনে কারো বিরুদ্ধে মন্তব্য করা অত্যন্ত বিপজ্জনক কাজ। একজন মুমিনের উচিত সত্যতা যাচাই না করে কোনো বিষয়ে কথা না বলা এবং নিজের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা।

مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ

অর্থ : "যে ব্যক্তি কোনো সৎকর্ম নিয়ে আসবে, তার জন্য তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান থাকবে। আর সেদিন (কিয়ামতের দিন) তারা ভয়-ভীতি থেকে নিরাপদ থাকবে।"

(সূরা আন-নামল : আয়াত ৮৯)

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা নেক আমলের ফলাফল দুইভাবে উল্লেখ করেছেন—

১) সৎকর্মের প্রতিদান

২) কিয়ামতের ভয় থেকে নিরাপত্তা।

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে ভালো কাজ করবে, মানুষের অধিকার রক্ষা করবে এবং গীবত, অপবাদ ও অন্যায় কথা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে, আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম প্রতিদান দান করবেন। শুধু তাই নয়, কিয়ামতের ভয়াবহ দিনেও সে নিরাপদ থাকবে। এই আয়াত মানুষকে নেক আমলের প্রতি উৎসাহিত করে এবং খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকতে শিক্ষা দেয়। গীবত মানুষের নেক আমল নষ্ট করে দেয়, পক্ষান্তরে ভালো কথা, উত্তম আচরণ ও অন্যের সম্মান রক্ষা করা নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত এমন কাজ করা, যা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হয় এবং আখিরাতে মুক্তির কারণ হয়।

হাদীসের আলোকে গীবত:

মিরাজের হাদীস :

রাসুলুল্লাহ ﷺ মিরাজের রাতে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি ও আখিরাতের ভয়াবহ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সেই সময় তিনি এমন কিছু মানুষকে দেখতে পান, যাদের নখ ছিল তামা বা তামার মতো লোহার তৈরি। তারা সেই নখ দিয়ে নিজেদের মুখ ও বুক চিরছিল বা আঁচড়াচ্ছিল। এই দৃশ্য ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ ও ভীতিকর। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ জিবরীল (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, "এরা কারা?"

জিবরীল (আঃ) বললেন : "এরা সেই লোকেরা যারা দুনিয়াতে মানুষের গীবত করত, মানুষের মাংস খেত অর্থাৎ মানুষের পেছনে বদনাম ও সমালোচনা করত।"

(আবু দাউদ)

এই হাদীসের মাধ্যমে গীবতের ভয়াবহ পরিণতি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। যারা দুনিয়াতে নিজেদের জবানকে নিয়ন্ত্রণ করেনি এবং অন্যের সম্মান নষ্ট করেছে, আখিরাতে তাদেরকে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। এখানে নিজেদের মুখ ও বুক আঁচড়ানোর শাস্তি বোঝায় যে, তারা নিজেদের মুখের কথার কারণেই শাস্তি ভোগ করছে।

মানুষ সাধারণত গীবতকে ছোট গুনাহ মনে করে এবং আড্ডা, আলোচনা বা হাসি-ঠাট্টার মধ্যে সহজেই অন্যের দোষ বর্ণনা করে। অথচ এই হাদীস আমাদের সতর্ক করে যে, গীবতের শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ। তাই একজন মুসলমানের উচিত সবসময় নিজের কথাবার্তার ব্যাপারে সতর্ক থাকা এবং অন্যের সম্মান রক্ষা করা।

কিয়ামতের দিন নেকী হারানো :

কিয়ামতের দিন নেকী হারানোর ব্যাপারে সহীহ মুসলিমের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস রয়েছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদের জিজ্ঞেস করলেন : "তোমরা কি জানো, নিঃস্ব (মুফলিস) কে?"

সাহাবাগণ বললেন : "যার টাকা-পয়সা ও সম্পদ নেই, সে-ই নিঃস্ব।"

তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন : "আমার উম্মতের মধ্যে প্রকৃত নিঃস্ব সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন সালাত, সিয়াম, যাকাত নিয়ে আসবে, কিন্তু সে দুনিয়াতে কাউকে গালি

দিয়েছে, কারও প্রতি অপবাদ দিয়েছে, কারও সম্পদ খেয়েছে, কাউকে হত্যা করেছে বা মেরেছে। তাই তাদের প্রত্যেককে তার নেকি দিয়ে দেওয়া হবে। তার নেকি শেষ হয়ে গেলে তাদের গুনাহ তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে, অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।”

(সহীহ মুসলিম)

এই হাদীস আমাদের সামনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষা তুলে ধরে। অনেক মানুষ মনে করে শুধু নামাজ, রোজা ও অন্যান্য ইবাদত করলেই সফলতা অর্জন করা যাবে। কিন্তু মানুষের হক নষ্ট করলে, গীবত করলে বা কাউকে কষ্ট দিলে সেই নেক আমল আখিরাতে কোনো উপকারে আসবে না।

গীবতের মাধ্যমে একজন মানুষের সম্মান নষ্ট করা হয়। তাই কিয়ামতের দিন যার গীবত করা হয়েছে, তাকে নিজের নেক আমল দিয়ে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এভাবে একসময় সব নেকি শেষ হয়ে যাবে। এরপর অন্যদের গুনাহ তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। এই হাদীস গীবতের ভয়াবহ পরিণতি এবং মানুষের হক রক্ষা করার গুরুত্ব অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরে।

জবান সংযত রাখার হাদীস :

হাদীস শরীফে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন : “মানুষকে জাহান্নামে উপুড় করে ফেলার অন্যতম কারণ হবে তাদের নিজেদের মুখের অসংযত কথাবার্তা।”

এই হাদীসের মাধ্যমে বোঝা যায় যে মানুষের জবান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নেয়ামত। মানুষ তার জবানের মাধ্যমে ভালো কথাও বলতে পারে, আবার খারাপ কথার মাধ্যমেও গুনাহে জড়িয়ে পড়তে পারে। গীবত, অপবাদ, মিথ্যা, গালি ও কটু কথা— সবই জবানের অপব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত।

এই জবান হলো একটা সরকারি মেশিন, যা আল্লাহ তায়ালা নিজ রহমতে দান করেছেন। এ মেশিন জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত চলতে থাকে। এই মেশিনে তেলের প্রয়োজন হয় না, সার্ভিসিং বা মেরামতেরও প্রয়োজন হয় না। অথচ এটা তার নিজস্ব গতিতে সার্ভিস দিয়ে আসছে। যখনই মনে কোনো কথা আসে, তখনই এই জবানের মাধ্যমে তা বের হয়ে চলে আসে।

এই নেয়ামত আমরা ছোটবেলা থেকে উপভোগ করে আসছি। এটা হাসিল করতে আমাদের কোনো রকম কষ্ট করতে হয়নি এবং ব্যবহারের জন্য কোনো টাকা-পয়সাও খরচ করতে হয় না। যার কারণে আমরা আমাদের জবানের কদর করি না। মানুষ খুব

সহজেই যা মনে আসে তাই বলে ফেলে, অথচ সেই কথার কারণেই আখিরাতে কঠিন জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হতে পারে।
তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত নিজের জবানকে সংযত রাখা এবং চিন্তা-ভাবনা করে কথা বলা। কারণ একটি ভুল কথা মানুষের সম্মান নষ্ট করতে পারে, সম্পর্ক ধ্বংস করতে পারে এবং আখিরাতে শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

গীবতের কারণ

হিংসা,রাগ,প্রতিশোধ :

হিংসা,রাগ,প্রতিশোধ মানুষের নৈতিক অবক্ষয় ঘটায়। যা তাকে গীবতের মতো পাপের দিকে নিয়ে যায়।কেউ যখন কারো উন্নতি,সফলতা সহ্য করতে পারে না তখন হিংসার বশবর্তী হয়ে তার নামে বদনাম করে মানসিক তৃপ্তি খোঁজে । অন্যদিকে রাগের ফলে মানুষ নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।যার কারণে সে মুখ দিয়ে এমন কথা উচ্চারণ করে যা অন্যের সম্মান হানি করে।আবার মানুষ যখন প্রতিশোধের আগুনে জ্বলে পুড়ে যায় তখন প্রতিপক্ষকে ছোটো করার মানসিকতায় তার নামে নানা মিথ্যাচার প্রচার করে বেড়ায়।

অবসর সময় :

মানুষ যখন অবসর সময় কাটায়, তখন অনেক ক্ষেত্রে সেই সময়কে সঠিক ও উপকারী কাজে ব্যবহার না করে উদ্দেশ্যহীন আড্ডা, গল্প-গুজব ও অনর্থক কথাবার্তায় মেতে থাকে। দীর্ঘ সময় ধরে চলা এসব আড্ডায় ধীরে ধীরে বিভিন্ন মানুষের ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। ফলে তখনই কারো না কারো নামে দোষ খুঁজে বের করে তা নিয়ে আলোচনা শুরু করে আর গীবত করে ফেলে।
অনেক সময় মানুষ প্রথমে সাধারণ কথাবার্তা বললেও পরে অন্যের আচরণ, চলাফেরা, পারিবারিক বিষয় বা ব্যক্তিগত ত্রুটি নিয়ে কথা বলতে শুরু করে। কেউ একজন কোনো ব্যক্তির দোষ উল্লেখ করলে অন্যরাও তাতে অংশগ্রহণ করে এবং বিষয়টি ধীরে ধীরে গীবতে পরিণত হয়। এভাবে অবসর সময়ের অনর্থক আড্ডা মানুষকে অজান্তেই বড় গুনাহের দিকে নিয়ে যায়।

বর্তমান সমাজে চায়ের দোকান, বন্ধুদের আড্ডা, পারিবারিক আলোচনা কিংবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দীর্ঘ সময় কাটানোর ফলে গীবতের প্রবণতা আরও বেড়ে যাচ্ছে। মানুষ উপকারী কাজের পরিবর্তে অন্যের সমালোচনায় বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। তাই অবসর সময়কে উপকারী ও কল্যাণকর কাজে ব্যয় করা অত্যন্ত জরুরি, যাতে মানুষ গীবতের মতো গুনাহ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে।

খারাপ পরিবেশ :

খারাপ পরিবেশ গীবতের অন্যতম একটি কারণ। যেসব পরিবেশে নৈতিকতার চর্চা কম হয়, সেখানে মানুষ ভালো কথা কম বলে এবং অন্যের দোষ নিয়ে আলোচনা করে বেশি। মানুষ সাধারণত তার আশপাশের পরিবেশ ও সঙ্গের দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই যদি কোনো পরিবেশে গীবত, সমালোচনা ও অন্যের দোষ চর্চা স্বাভাবিক বিষয় হয়ে যায়, তাহলে সেখানে থাকা ব্যক্তিরাও ধীরে ধীরে এ কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

খারাপ পরিবেশে মানুষ অন্যের সম্মান রক্ষা করার পরিবর্তে তার ত্রুটি ও দুর্বলতা খুঁজে বের করতে বেশি আগ্রহী হয়। বন্ধুদের আড্ডা, কর্মক্ষেত্র, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিংবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম— যেখানেই নেতিবাচক আলোচনা বেশি হয়, সেখানেই গীবতের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। অনেক সময় মানুষ শুধু অন্যদের সাথে তাল মিলানোর জন্যও গীবতে অংশগ্রহণ করে।

এ ধরনের পরিবেশ মানুষের চরিত্র ও নৈতিকতার উপর খারাপ প্রভাব ফেলে। ধীরে ধীরে মানুষের জিহ্বা অসংযত হয়ে যায় এবং গীবতকে স্বাভাবিক বিষয় মনে হতে শুরু করে। তাই গীবত থেকে বাঁচতে হলে ভালো পরিবেশ ও সৎ সঙ্গ গ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভালো পরিবেশ মানুষকে উত্তম কথা বলতে উৎসাহিত করে এবং খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে।

গীবতের ক্ষতিকর প্রভাব

ব্যক্তিগত ক্ষতি :

➡ গীবতের ফলে মানুষের ঈমান দুর্বল হয়ে যায়।

➡ মানুষ যার নেকী হারিয়ে ফেলে ।

➡ আত্মা কলুষিত হয়ে যায় ফলে সে ঠিক ভুল বিচার করার ক্ষমতা হারায়।

সামাজিক ক্ষতি:

➡ গীবতের ফলে সমাজে শান্তি নষ্ট হয় এবং পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হয়।

➡ সমাজে সকলের মাঝে ফিতনা সৃষ্টি হয়।

➡ বন্ধু বান্ধব সকলে এক অপরের প্রতি বিশ্বাস হারায়।

আখিরাতের ক্ষতি :

➡ এক হাদিসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে সমস্ত লোক গীবত করে বেড়ায়, তাদের কেউ কেউ দুনিয়াতে বাহ্যিকভাবে অনেক ভালো আমলকারী হবে। তারা নামাজ, রোজা সহ বিভিন্ন প্রকার ইবাদতের ভান্ডার নিয়ে কিয়ামতের ময়দানে উপস্থিত হবে। বাহ্যিকভাবে তাদেরকে সফল মনে হলেও বাস্তবে তারা বড় বিপদের মধ্যে থাকবে। কারণ তারা দুনিয়াতে মানুষের সম্মান নষ্ট করেছে এবং গীবতের মাধ্যমে অন্যের হক নষ্ট করেছে।

কিয়ামতের দিন মানুষকে পুলসিরাত অতিক্রম করতে হবে। যারা প্রকৃত মুমিন, তারা সহজেই এই পুল পাড়ি দিয়ে জান্নাতে পৌঁছে যাবে। কিন্তু যাদের চূড়ান্ত ঠিকানা জাহান্নাম, তাদের সেই পুলসিরাত থেকে নিচে টেনে জাহান্নামে ফেলে দেওয়া হবে। সে সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারবে না। দুনিয়াতে সে যাদের গীবত করেছিল, তাদের জন্য কাফফারা আদায় না করা পর্যন্ত এবং সেই ব্যক্তি তাকে ক্ষমা না করা পর্যন্ত সে জান্নাতে যেতে পারবে না।

এই হাদিসের মাধ্যমে বোঝা যায় যে, গীবত শুধু মুখের গুনাহ নয়; বরং এটি বান্দার হকের সাথে সম্পর্কিত একটি মারাত্মক অপরাধ। একজন মানুষ হয়তো অনেক ইবাদত করবে, কিন্তু অন্যের সম্মান নষ্ট করার কারণে তার সেই আমল আখিরাতে উপকারে

আসবে না। তাই গীবতের মতো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা আখিরাতের মুক্তির জন্য অত্যন্ত জরুরি।

➡ আরেক হাদিসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিকৃষ্ট গুনাহ হলো সুদ, যার মাঝে অসংখ্য অনিষ্ট রয়েছে। এটি হলো অনেকগুলো গুনাহের সমষ্টি। যার সর্বনিম্ন গুনাহ হলো নিজের মায়ের সাথে খারাপ কাজ করার মতো জঘন্য। এরপর তিনি বলেন, সবচেয়ে নিকৃষ্ট গুনাহ হলো কোনো মুসলমানের ওপর তার মুসলমান ভাইয়ের ইজ্জতের উপর আক্রমণ করা।

এখানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গীবত সম্পর্কে অনেক কঠিন ধমকি দিয়েছেন। কারণ গীবতের মাধ্যমে একজন মানুষের সম্মান ও মর্যাদা নষ্ট করা হয়। ইসলাম মানুষের ইজ্জত ও সম্মানকে অত্যন্ত মূল্যবান হিসেবে গণ্য করেছে। তাই কারো সম্মানের উপর আঘাত করা অত্যন্ত বড় গুনাহ।

বর্তমান সমাজে মানুষ খুব সহজেই অন্যের সমালোচনা করে, দোষ প্রচার করে এবং এটিকে সাধারণ বিষয় মনে করে। অথচ গীবতের মাধ্যমে একজন মানুষের ইজ্জতের উপর আক্রমণ করা হয়, যা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ হিসেবে গণ্য।

➡ সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এসেছে— রাসূল ﷺ দুই কবরের পাশ দিয়ে গিয়ে বললেন : "এদের দুজনকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। একজন চোগলখোরি বা কথা লাগাতো, আর অন্যজন পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জনে অসতর্ক ছিল।"

এই হাদিসে কবরের শাস্তির একটি ভয়াবহ দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। এখানে চোগলখোরি বা একজনের কথা আরেকজনের কাছে লাগিয়ে দেওয়াকে কবরের আযাবের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অনেক সময় মানুষ একজনের কথা আরেকজনের কাছে পৌঁছে দিয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া, বিভেদ ও শত্রুতা সৃষ্টি করে। এভাবে সমাজে অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে এবং সম্পর্ক নষ্ট হয়।

এই হাদিস আমাদের সতর্ক করে যে, শুধু বড় বড় গুনাহ নয়; বরং মুখের কথার কারণেও মানুষ কবরের শাস্তির সম্মুখীন হতে পারে। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত নিজের জবানকে সংযত রাখা এবং কারো কথা অন্যের কাছে লাগানো থেকে বিরত থাকা।

➡ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ

অর্থ : "পরনিন্দাকারী ও চোগলখোর ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

— সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম

এখানে এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যে একজনের কথা আরেকজনের কাছে লাগিয়ে সম্পর্ক নষ্ট করে, ঝগড়া সৃষ্টি করে এবং গীবত ও পরনিন্দা ছড়ায়। এ ধরনের মানুষ সমাজে বিভেদ ও অশান্তি সৃষ্টি করে। তাদের কারণে মানুষে মানুষে সম্পর্ক নষ্ট হয় এবং পারস্পরিক বিশ্বাস কমে যায়।

এই হাদিসের মাধ্যমে বোঝা যায় যে, গীবত, পরনিন্দা ও চোগলখোরি মানুষের আখিরাতের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। একজন মানুষ যদি নিজের জবানকে নিয়ন্ত্রণ না করে, তাহলে তার ইবাদতও তাকে মুক্তি দিতে পারবে না। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত কথা বলার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা এবং অন্যের সম্মান রক্ষার চেষ্টা করা।

আধুনিক সমাজে গীবত

সোশ্যাল মিডিয়াতে গীবত:

বর্তমান সময়ে মানুষ গীবত করার জন্য অনলাইন প্ল্যাটফর্ম গুলোকে বেশি পছন্দের সাথে বেছে নিয়েছে।সরাসরি হাতে গোনা মানুষের সামনে গীবত করলেও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টে বা কমেন্টের মাধ্যমে এখন হাজার হাজার মানুষের সামনে অন্যের দোষ - ত্রুটি ,দুর্বলতা নিয়ে আলোচনা করা হয়। সোশ্যাল মিডিয়াতে গীবতের বিভিন্ন রূপ দেখা যায়।যেমন : কাউকে নিয়ে ট্রল করা,অপমান জনক মিম করা,ব্যক্তিগত ছবি বা তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া ,স্ক্রিনশট প্রকাশ করা , ইঙ্গিতপূর্ণ স্ট্যাটাস দেওয়া বা কারো চরিত্র নিয়ে আলোচনা করা ।

ফ্রেন্ড সার্কেলে আলোচনা ও গসিপ :

অনেক সময় বন্ধু মহলেও এমন হয়ে থাকে যে এক বন্ধু অবলীলায় অন্য বন্ধুর সাথে হাসি মজা করে থাকে ।সেখানে একজন আরেকজনের সাথে দুষ্টুমি খুনসুটি করে থাকে ।কিন্তু এর কারণে কেউ কারো কথায় কষ্ট বোধ করে না ।কষ্ট দেওয়া ও উদ্দেশ্য না ।তবে কিছু কোন এমন হয়ে থাকেন যারা হাসি মজা মেনে নিতে পারেন না।যার কারণে ছোট কথায় ও রেগে যায়।তখন দেখা যায় এমন লোককে রাগানোর জন্য বন্ধুরা হাসি মজা বাড়িয়ে দেয়।এখন যদিও বন্ধুরা তার সঙ্গে ভণিতা না করে অবলীলায় ঠাট্টা

ও আজে বাজে কথা বলছে ,কিন্তু যেহেতু সে কষ্ট পাচ্ছে তাই এই ধরনের হাসি মজা জায়েয নেই।কোনো মুসলমানকে তার অপ্রিয় ও বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলে কষ্ট দেওয়া জায়েজ নেই। এই সম্পর্কে কুরআনুল কারিমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেন :

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ

অর্থ :"যখন তোমরা একে মুখে মুখে গ্রহণ করছিলে এবং তোমাদের মুখে এমন কথা বলছিলে, যার সম্পর্কে তোমাদের কোনো জ্ঞান ছিল না। তোমরা এটাকে সামান্য মনে করছিলে, অথচ আল্লাহর কাছে তা ছিল অত্যন্ত গুরুতর।"**(সূরা আন-নূর — আয়াত ১৫)**

অর্থাৎ মানুষ অনেক সময় কোনো কথা যাচাই না করেই একে অন্যের কাছে বলে বেড়ায়। মনে করে "এতে কী হয়েছে?" — কিন্তু আল্লাহর কাছে তা বড় গুনাহ হতে পারে।

অফিস বা ক্লাসে গীবত :

গীবত শুধু কোনো ধর্মীয় আলোচনা বা ব্যক্তিগত আড্ডায় সীমাবদ্ধ নয়; বরং অফিস, কর্মক্ষেত্র ও ক্লাসরুমেও এটি ব্যাপকভাবে হয়ে থাকে। দৈনন্দিন জীবনে মানুষ একসাথে কাজ করতে গিয়ে বা পড়াশোনার পরিবেশে দীর্ঘ সময় একত্রে অবস্থান করার কারণে অনেক সময় অজান্তেই গীবতের মতো গুনাহে জড়িয়ে পড়ে।

অফিসে কোনো কলিগের অনুপস্থিতিতে তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলোচনা করা, তার ভুল-ত্রুটি নিয়ে সমালোচনা করা অথবা তার কাজকে ছোট করে দেখা গীবতের অন্তর্ভুক্ত। অনেক সময় কোনো সহকর্মীর পদোন্নতি হলে তাকে নিয়ে হিংসাপূর্ণ মন্তব্য করা হয় বা তার সাফল্যকে খাটো করার চেষ্টা করা হয়। কেউ কেউ অন্যের দুর্বলতা প্রকাশ করে নিজেকে ভালো প্রমাণ করতে চায়। এর ফলে অফিসের পরিবেশ নষ্ট হয় এবং সহকর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও সৌহার্দ্য কমে যায়।

একইভাবে ক্লাসরুমেও গীবতের প্রবণতা দেখা যায়। কোনো সহপাঠীর অনুপস্থিতিতে তার ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা, তার চলাফেরা বা আচরণ নিয়ে হাসাহাসি করা কিংবা তার ভালো ফলাফল নিয়ে সমালোচনা করা গীবতের অন্তর্ভুক্ত। অনেক সময় কেউ ভালো ফলাফল করলে বা শিক্ষকের প্রশংসা পেলে অন্যরা হিংসা থেকে

তার নামে নেতিবাচক মন্তব্য করে। এতে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নষ্ট হয় এবং শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অনেক সময় হিংসা, রাগ ও প্রতিশোধের কারণে মানুষ অন্যের বদনাম করে নিজেকে ভালো অবস্থানে দেখানোর চেষ্টা করে। তারা মনে করে অন্যকে ছোট করলে নিজের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু বাস্তবে এর মাধ্যমে মানুষের চরিত্রের দুর্বলতা প্রকাশ পায় এবং সমাজে অশান্তি ও বিভেদ সৃষ্টি হয়।

গীবত কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সুন্দর পরিবেশ নষ্ট করে দেয়। এর ফলে মানুষ একে অপরের প্রতি আস্থা হারায় এবং সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। তাই অফিস, ক্লাসরুম বা যেকোনো সামাজিক পরিবেশে অন্যের সম্মান রক্ষা করা এবং গীবত থেকে দূরে থাকা প্রত্যেক মানুষের দায়িত্ব।

গীবত কখন করা জায়েয:

শরীয়ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই কিছু কিছু অবকাশ রেখেছে।সে সব সময় মানব প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখে ছাড় দিয়েছে ।শরীয়ত কখনোই মানুষের বৈধ প্রয়োজন উপেক্ষা করেনি।গীবতের ক্ষেত্রেও সে কয়েকটি বিষয়কে পৃথক রেখেছে । যেমন:

এক : যেসব ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে বা তার মৃত্যুর পর তার মন্দ দিকগুলো বর্ণনা করার এমন কোনো প্রয়োজন দেখা দেয় যা শরীয়তের দৃষ্টিতে সঠিক এবং গীবত ছাড়া এ প্রয়োজন পূরণ হতে পারে না, তাহলেও এ প্রয়োজন পূরণের জন্য গীবত করা হলে তার চেয়েও অধিক মন্দ কাজ অপরিহার্য হয়ে পড়ে, এমন ক্ষেত্রসমূহ গীবত হারাম হওয়া সম্পর্কিত নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যতিক্রমকে মূলনীতি হিসেবে এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ

“কোন মুসলমানের মান-মর্যাদার ওপর অন্যায়ভাবে আক্রমণ করা জঘন্যতম জুলুম।”

এ হাদিসে “অন্যায়ভাবে” কথাটি বলে সতর্ক করতে বুঝা যায়, ন্যায়ভাবে এরূপ করা জায়েয। নবী সা.-এর নিজের কর্মপদ্ধতির মধ্যে এমন কয়েকটি নজির দেখতে পাই যা থেকে জানা যায়, ন্যায়ভাবে বলতে কি বুঝানো হয়েছে এবং কি রকম পরিস্থিতিতে প্রয়োজনে গীবত করা জায়েয হতে পারে।

দুই :একবার এক বেদুঈন এসে নবী সা.-এর পিছনে নামাজে শামিল হলো এবং নামাজ শেষ হওয়া মাত্রই একথা বলে প্রস্থান করলো, হে আল্লাহ! আমার ওপর রহম করো এবং মুহাম্মদের উপর রহম করো। আমাদের দু'জন ছাড়া আর কাউকে এ রহমতের মধ্যে শরীক করো না। তখন নবী করীম সা. সাহাবীদের বললেনঃ

"তোমরা কি বলো, এ লোকটাই বেশী বেকুফ, না তার উট? তোমরা কি শুননি সে কি বলছিলো?" (আবু দাউদ)

নবী সা.কে তার অনুপস্থিতেই একথা বলেছেন। কারণ সালাম ফেরানো মাত্রই সে চলে গিয়েছিল। নবীর উপস্থিতেই সে একটি ভুল কথা বলে ফেলেছিল। তাই এ ব্যাপারে তাঁর নিশ্চুপ থাকা কাউকে এ ভ্রান্তিতে ফেলতে পারতো যে, সময় বিশেষে এরূপ কথা বলা হয়তো জায়েয। তাই নবী সা. কর্তৃক একথার প্রতিবাদ করা জরুরী হয়ে পড়েছিল।

তিন : ফাতেমা বিনতে কায়েস রা. নামক এক মহিলাকে দু' ব্যক্তি বিয়ের প্রস্তাব দেন। একজন হযরত মুয়াবিয়া রা. অপরজন আবুল জাহম রা.। ফাতেমা বিনতে কায়েস নবী সা.কে কাছে এসে পরামর্শ চাইলে তিনি বললেনঃ **"মুয়াবিয়া গরীব আর আবুল জাহম স্ত্রীদের বেদম প্রহার করে থাকে"। (বুখারী ও মুসলিম)**
এখানে একজন নারীর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রশ্ন জড়িত ছিল। সে নবী সা.কে কাছে এ ব্যাপারে পরামর্শ চেয়েছিল। এমতাবস্থায় উভয় ব্যক্তির যে দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটি তাঁর জানা ছিল তা তাকে জানিয়ে দেয়া তিনি জরুরী মনে করেন।

চার : রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন একজন সর্ববিষয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষক। তিনি আমাদেরকে সকল বিষয়ই শিক্ষা দিয়েছেন। হযরত আয়েশা রাদি. বর্ণনা করেন, একদা আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে বসেছিলাম। তখন জনৈক ব্যক্তি আমাদের সামনে হাজির হলো। ওই ব্যক্তি সম্পর্কে তিনি বললেন,

"بِئْسَ أَخُ الْعَشِيرَةِ"

এ ব্যক্তি তার গোত্রের খারাপ লোক।

হযরত আয়েশা রাদি. বলেন, একথা শুনে আমি জড়সড়ো হয়ে গেলাম। কারণ ওই ব্যক্তি খারাপ লোক; তাই সতর্ক থাকা দরকার। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভ্যাসমতো ওই ব্যক্তির সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ কথোপকথন করতে লাগলেন। সে ব্যক্তি চলে যাওয়ার পর হযরত আয়েশা রাদি. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা আপনি বললেন, ওই ব্যক্তি খারাপ লোক। তথাপি তার সঙ্গে এত সুন্দর করে নরম ভাষায় কথা বললেন, পাশে বসলেন? এ কেমন কথা!
তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দেখো! ওই ব্যক্তি খারাপ লোক। কারণই লোকেরা তার চরিত্রের খারাপির থেকে বাঁচার জন্য তার নিজের অবস্থানে ছেড়ে দেয়। অর্থাৎ তার পক্ষ থেকে ফিতনা-ফাসাদের ভয়ে তার সঙ্গে নরম ভাষায় কথা বলে ও তদন্ত ত্যাগ করে রাখে। এমনটা না করা হলে সে ফিতনা সৃষ্টি করতে পারে। এজন্য আমি আমার ভয়াস অনুযায়ী তার সঙ্গে নরম ভাষায় কথা বলেছি।"

উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় উলামাগণ বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে হজরত আয়েশা রাদি.-কে বলেছিলেন, ওই ব্যক্তি খারাপ লোক। পরিতের একথা যদিও প্রকাশ্য গীবত – কারণ ওই ব্যক্তির পেছনে তার দোষ বর্ণনা করা হয়েছে- তবু এটা জায়েজ। এর মাধ্যমে হজরত আয়েশা রাদি.-কে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করাই উদ্দেশ্য ছিল। যেন ওই ব্যক্তির পক্ষ হতে হজরত আয়েশা রাদি. কোনো ধরনের ফিতনার শিকার না হোন। কোনো কারও পক্ষ হতে কোনো ব্যক্তির ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে সে ব্যক্তি সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়া গীবত নয়। এমনটিই করা জায়েজ।

পাঁচ : এক সময় আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে উতবা এসে নবী সা.কে বললো, "আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক। আমার ও আমার সন্তানের প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট
হতে পারে এমন অর্থকড়ি সে দেয় না।" **(বুখারী ও মুসলিম)**
স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীর এ ধরনের অভিযোগ যদিও গীবতের পর্যায়ে পড়ে কিন্তু নবী সা. তা বৈধ করে দিয়েছেন। কারণ জুলুমের প্রতিকার করতে পারে এমন ব্যক্তির কাছে জুলুমের অভিযোগ নিয়ে যাওয়ার অধিকার মজলুমের আছে।

০ ০ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের এসব দৃষ্টান্তের আলোকে ফকীহ ও হাদীস বিশারদগণ এ বিধি প্রণয়ন করেছেন যে, গীবত কেবল তখনই বৈধ, যখন সংগত (অর্থাৎ শরীয়তের দৃষ্টিতে সংগত) কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তার প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং ঐ প্রয়োজন গীবত ছাড়া পূরণ হতে পারে না। মুদ্দারা এ বিধির ওপর ভিত্তি করে আলেমগণ নিম্নরূপ গীবতকে বৈধ বলে ঘোষণা করেছেনঃ

ছয় : শরিয়তে আরো একটি স্থানে গীবত করার অনুমতি দিয়েছে। তাহলো, কোনো এক ব্যক্তি আমার ওপর জুলুম করল। এখন আমি যদি সেই কথা অন্যের কাছে বলে ব্যক্ত করি যে, আমার সঙ্গে এই জুলুম করা হয়েছে। এভাবে সে আমার ওপর অবিচার করেছে। তাহলে এটি গীবত হবে না। এর কারণে গুনাহ হবে না। আমি যার কাছে আমার জুলুমের খতিয়ান পেশ করেছি, সে ব্যক্তি ওই জুলুমের প্রতিকার করতে সক্ষম হোক বা না হোক; সর্বাবস্থায় এটি গীবত হবে না। যেমন, কোনো ব্যক্তি আমার কোনো কিছু চুরি করেছে। এখন আমি থানায় নালিশ করলাম যে, অমুক ব্যক্তি আমার এ জিনিস ছিনিয়ে নিয়েছে । তাহলে এভাবে আমার নালিশ করাটি যদিও ওই ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার নিন্দাচর্চা হচ্ছে; কিন্তু এটি গীবতের আওতাভুক্ত হবে না। কেননা, আমার ওপর অবিচার করা হয়েছে। আমার ক্ষতি করা হয়েছে। আমি তার জুলুমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছি ।কাজেই এটি গীবত হবে না।

সাত : সংশোধনের উদ্দেশ্যে এমন ব্যক্তিদের কাছে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অপকর্মের কথা বলা, যারা তার প্রতিকার করতে পারবেন বলে আশা করা যায়।

আট : ফতোয়া চাওয়ার উদ্দেশ্যে কোনো মুফতির কাছে প্রকৃত ঘটনা বর্ণনার সময় যদি কোনো ব্যক্তির কাজ-কর্মের উল্লেখ করা প্রয়োজন হয়।

নয় : মানুষকে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের অপকর্মের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য সাবধান করে দেয়া। যেমনঃ **হাদীস বর্ণনাকারী, সাক্ষী এবং গ্রন্থ প্রণেতাদের দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি বর্ণনা করা সর্বসম্মত মতে শুধু জায়েযই নয়, বরং ওয়াজিব।**

কেননা, এ ছাড়া শরীয়তকে ভুল রেওয়ায়েতের প্রচারণা ও বিস্তার থেকে আদালতসমূহকে বেইনসাফী থেকে এবং জনসাধারণ ও শিক্ষার্থীদেরকে গোমরাহী থেকে, রক্ষা করা সম্ভব নয়। অথবা উদাহরণ হিসেবে বলা যায় : কোনো ব্যক্তি কারো সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে আগ্রহী কিংবা কারো বাড়ীর পাশে বাড়ী খরিদ করতে চায়, অথবা কারো সাথে অংশীদারী কারবার করতে চায়, অথবা কারো কাছে আমানত রাখতে চায়, এমন ব্যক্তি আপনার কাছে পরামর্শ চাইলে তাকে সে ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি ও ভাল-মন্দ সম্পর্কে অবহিত করা আপনার জন্য ওয়াজিব, যাতে না জানার কারণে সে প্রতারিত না হয়।

দশ : যেসব লোক পাপকাজের বিস্তার ঘটাচ্ছে অথবা বিদআত ও গোমরাহীর প্রচার চালাচ্ছে অথবা আল্লাহর বান্দাদেরকে ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড ও জুলুম-নির্যাতনের মধ্যে নিক্ষেপ করছে, তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সোচ্চার হওয়া এবং তাদের দুষ্কর্ম ও অপকীর্তির সমালোচনা করা।

এগারো : যেসব লোক কোনো মন্দ নাম বা উপাধিতে এতই বিখ্যাত হয়েছে যে, ঐ নাম ও উপাধি ছাড়া অন্য কোনো নাম বা উপাধি দ্বারা তাদের আর চেনা যায় না, তাদের মর্যাদাহানির উদ্দেশ্যে নয়, বরং পরিচয় দানের জন্য ঐ নাম ও উপাধি ব্যবহার করা।

বারো : অবস্থা বিশেষে গীবত ওয়াজিব হয়ে যায়। যেমন, আমি দেখতে পেলাম এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে হত্যা করার পরিকল্পনা করছে । তাকে গোপনে আক্রমণ করার চক্রান্ত করছে। এমতাবস্থায় ওই ব্যক্তিকে জানিয়ে দেওয়া ওয়াজিব যে, তোমার জীবনাশের চক্রান্ত হচ্ছে। কাজেই তুমি আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নাও। বুঝা গেল, এ ধরনের পরিস্থিতিতে গীবত করা নাজায়েজ নয়।

(ফাতহুল বারী, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬২; শরহে মুসলিম-নবী, বাবঃ তাহরীমুল গীবাত। রিয়াদুস সালেহীন, বাবঃ মা ইয়ুবাহ মিনাল গীবাত। আহকামুল কুরআন-জাস্সাস। সহহ মা'আনী-লা ইয়াগতাব বাদুকুম বাদান-আয়াতের তাফসীর)।

ফাসেক পাপাচারীর গীবত করা জায়েয নয় :

হযরতে থানবী রহ. বলেন, কোনো এক মজলিসে হযরত উমর রাদি.-এর কাছে আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদি. উপস্থিত ছিলেন। ওই মজলিসে এক ব্যক্তি হজ্জাজ বিন ইউসুফের মন্দ কর্মগুলো সম্পর্কে মন্তব্য করতে লাগল। হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদি. ওই ব্যক্তিকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "তুমি যে তার নিন্দা আলোচনা করছ তাকে গীবত বলে । তুমি এটা মনে করো না যে, হজ্জাজের গর্দানের ওপর এত মুসলমানের রক্ত; তাই হজ্জাজের গীবত করা হালাল হয়ে যাবে; মূলত বিষয়টি এমন নয়; বরং হজ্জাজের গর্দানের উপর যত মুসলমানের রক্ত রয়েছে তার হিসাব আল্লাহ তাআলা তার থেকেই নেবেন। আর তোমার এ গীবতের হিসাবও তখন তোমার থেকে নেবেন যা তুমি তার ব্যাপারে এখন করছ। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।"

এ কথা ধারণা করার কোনো সুযোগ নেই যে ,অমুক ব্যক্তি ফাসেক, অমুক ব্যক্তির আমলে বিদআত ,কাজেই যত ইচ্ছা তার গীবত করে নেবে; বরং এ ধরনের গীবত থেকেও নিজেকে দূরে রাখো। কেননা এগুলো পরিহার করাও অপরিহার্য।

গীবত থেকে বাঁচার উপায়

কথা বলার আগে চিন্তা করা :

জবানের ব্যবহারের ক্ষেত্রে কীভাবে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়, তার তরিকা হজরত থানভি রহ. শিখিয়ে দিয়েছেন যে, প্রথমে ভাবো যে, সে কথাটি আমি বলতে চাচ্ছি, তা সঠিক কিনা? আমার সেই কথা সীমাহীন হয়ে যাবে নাতো? তার মাঝে মিথ্যার মিশ্রণ চলে আসছে নাতো? আমি অতিরঞ্জন করছি নাতো? অসতর্ক পদক্ষেপ হচ্ছে নাতো?

আজকের পৃথিবীর সিংহভাগ ঝগড়া-বিবাদ স্রেফ এ কারণেই হয়ে থাকে যে, এক ব্যক্তি আগ-পিছু না ভেবে উল্টো-পাল্টা একটা মন্তব্য করে ফেলে। বিনা গবেষণা ও বিনা ভাবনার সেই একটি কথার কারণে এক মহল্লার সঙ্গে অন্য মহল্লার, এক বংশের সঙ্গে আরেক বংশের, এক পরিবারের সঙ্গে অন্য পরিবারের ঝগড়া বেঁধে যায়। কাজেই প্রথমে ভাবুন, কী কথা বলা হয়েছে? কী পরিমাণ বলা হয়েছে? যদি কারও কাছে সে কথা নকল করতে হয়, তাহলে কী পরিমাণ নকল করতে হবে? নিজের পক্ষ থেকে সেখানে সংযোজন করা যাবে না।

হজরত রহ. বলেন, আজকাল তো প্রত্যেকের জবান সমানে চলতে থাকার অভ্যাস হয়ে গেছে। থামার নামগন্ধ নেই। কাজেই ভাবনার সময় কোথায়? হজরত রহ. বলেন, যে কোনো বিষয় আয়ত্ত করতে হলে চর্চা লাগে। কাজেই চর্চা করুন। প্রথম দিকে হয়তো চিন্তা করার কথা মনে থাকবে না। কিন্তু একটু ভাবার অভ্যাস করতে সচেষ্ট হোন। ধীরে ধীরে অভ্যাস হয়ে যাবে। যদি প্রথমদিকে ভাবার কথা ভুলে যান তাহলে যখনই মনে পড়বে, এক দণ্ড ভেবে নেবেন। আবার যখন মনে পড়বে, আবার ভেবে নেবেন। এভাবে করতে করতে একসময় ভাবার অভ্যাস গড়ে উঠবে। এরপর আর ভুল হবে না, অবলীলায়, অকৃত্রিমভাবে ভাবনা চলে আসবে। তখন ভাবার জন্যে বিশেষভাবে ভাবার আয়োজন করার প্রয়োজন পড়বে না। তখন দেখা যাবে, মুখ থেকে যে কথা বেরোচ্ছে, একদম সঠিক আকারেই বেরোচ্ছে।গীবত,মিথ্যা ,কথা দিয়ে কারো মন ভাঙার মতো রোগের ওষুধ একটাই।

হজরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন:

مَن رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"যে ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার সম্মান রক্ষা করে (অর্থাৎ তার সম্ভ্রমের ওপর আক্রমণ প্রতিহত করে), কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার মুখমণ্ডল থেকে জাহান্নামের আগুন দূর করে দেবেন।" **(সুনানে তিরমিজি, সুনানে আহমাদ)**
কোনো মজলিশে বা আড্ডায় যখনই কোনো অনুপস্থিত ব্যক্তির নামে দোষচর্চা বা তার সম্মানহানির চেষ্টা করা হবে, একজন মুমিন হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলো—চুপ না থেকে তার পক্ষে কথা বলা এবং অন্যায়ভাবে তার সম্মান নষ্ট হতে না দেওয়া। এর বিনিময়ে আল্লাহ কিয়ামতের দিন আমাদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন।

আল্লাহকে ভয় করা ও যিকির করা:

গীবত মানুষের নেক আমল ধ্বংসকারী একটি বড় গুনাহ। এর থেকে বাঁচার অন্যতম উপায় হলো আল্লাহকে ভয় করা এবং বেশি বেশি যিকির করা। যখন মানুষের অন্তরে আল্লাহভীতি সৃষ্টি হয়, তখন সে কথা বলার আগে চিন্তা করে এবং অন্যের সম্মান নষ্ট করা থেকে বিরত থাকে। একজন মুমিন জানে যে মানুষের অগোচরে বলা প্রতিটি কথাও আল্লাহ তাআলা শুনেন এবং এর হিসাব কিয়ামতের দিন দিতে হবে। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

অর্থ :"মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তার কাছে উপস্থিত থাকে এক তৎপর পর্যবেক্ষক (ফেরেশতা)।"**(সূরা ক্বাফ, আয়াত ১৮)**এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা জানাচ্ছেন, মানুষ মুখে যা বলে—ভালো বা মন্দ—সবই ফেরেশতারা লিখে রাখে। একজন ডান পাশে থাকে নেক আমল লেখার জন্য, আরেকজন বাম পাশে গুনাহ লেখার জন্য। গীবত, অপবাদ, কটু কথা, মিথ্যা ইত্যাদি মুখ থেকে বের হওয়ার আগেই সতর্ক হওয়া জরুরি। তাই গীবত করার আগে আল্লাহর শাস্তি ও জবাবদিহিতার কথা স্মরণ করলে মানুষ সহজেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।কুরআনে আল্লাহ বলেন—

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

অর্থ: "যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়। জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।" **(সূরা রা'দ, আয়াত ২৮:)**
এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, সত্যিকারের শান্তি ধন-সম্পদ, মানুষ বা দুনিয়ার ভোগে নয়; বরং আল্লাহর যিকির ও স্মরণে।মানুষ দুনিয়ার চিন্তা, কষ্ট, ভয় ও অস্থিরতায়

ক্লান্ত হয়ে যায়। কিন্তু যখন সে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, তখন তার হৃদয়ে প্রশান্তি নেমে আসে। এজন্যই মুমিনের আসল শান্তির উৎস হলো আল্লাহর স্মরণ।
যিকিরের মাধ্যমে মানুষের রাগ, হিংসা ও অহংকার কমে যায়, যা গীবতের প্রধান কারণগুলোর একটি। বিশেষ করে "সুবহানাল্লাহ", "আলহামদুলিল্লাহ", "আস্তাগফিরুল্লাহ" ইত্যাদি যিকির মানুষের জিহ্বাকে ভালো কাজে ব্যস্ত রাখে। ফলে অপ্রয়োজনীয় কথা ও গীবত থেকে দূরে থাকা সহজ হয়।

গীবত হয়ে গেলে নিজেকে ক্ষুধার্ত রাখা:

এখন যাদের পক্ষে অর্থ ব্যয় করা কষ্টকর, তারা নিজেদের ওপর এই শাস্তি আরোপ করে নেবে যে, যদি আমি গীবত করি তাহলে এই পরিমাণ জরিমানা প্রদানের মাধ্যমে নিজেকে কষ্ট দেব। আর অর্থের প্রতি যাদের পরোয়া নেই তারা যদি নিজের ওপর এই আর্থিক জরিমানা বলবৎ করে তাহলে কোনো লাভ হবে না। তাদেরকে গীবতের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে অন্য রকম কষ্ট করতে হবে। কী সেই কষ্ট?

হজরত থানভি রহ. বলেন, তখন ব্যক্তি নিজের ওপর এই সিদ্ধান্ত চাপিয়ে নেবে যে, যদি আমি গীবত করি তাহলে এক বেলা না খেয়ে থাকব। খানা খাব না। অনশন করব।

আজকাল লোকেরা অনশনের উল্টো প্রয়োগ করছে। তারা অনশনের মাধ্যমে অন্যের ওপর চাপ প্রয়োগ করছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য ব্যক্তি তাদের কথা শুনবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা অনশন করবে। অনশনের কারণে অনেকে মারাও যায়। এই পদ্ধতি শরিয়তসম্মত নয়।

হজরত রহ. যে পদ্ধতির কথা বলেছেন, তা নিজের ওপর চাপ প্রয়োগ করার জন্যে বলেছেন যে, আমার কাজের কারণে আমি ক্ষুধার্ত থাকব; যেন আগামীতে আমি এমন কাজ না করি। কাজেই যখনই গীবত করে ফেলব, তখনি নিজের নফসকে ক্ষুধার মাধ্যমে কষ্ট দিবো। এই ক্ষুধা এমন জিনিস যে ,যদি কোনো ব্যক্তি এর উপর আমল

করে তাহলে কয়েকদিনের মধ্যে তার গীবতের রোগ দূর হয়ে যাবে । পরণীন্দার রোগ সেরে যাবে ।

গীবতের প্রকৃত ওষুধ বিনয় :

গীবতের অন্যতম চিকিৎসা হলো, বিনয়; কিন্তু এই বিনয় এক দিনেই সৃষ্টি হয় না। কাজেই যতদিন পর্যন্ত বিনয়ের গুণ অর্জিত না হবে ততদিন পর্যন্ত গীবত থেকে বাঁচার তাৎক্ষণিক চিকিৎসা হলো, চিন্তা-ভাবনা না করে কোনো কথা বলা যাবে না । যে কথাই বলবো, যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করেই বলবো। এতে গীবতের মাত্রা হ্রাস পেয়ে যাবে। আস্তে আস্তে পুরোপুরি চলে যাবে। যদি কখনো ভুলক্রমে কোনো কথা চিন্তা-ভাবনা ব্যতীত বেরিয়ে যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে দুই রাকাত নফল নামাজ 'সালাতুত তাওবাহ'-এর নিয়তে আদায় করে নিবো।

অর্থাৎ আমাদের থেকে কখনো যেন গীবত প্রকাশ না পায়; এ জন্য আমাদের যে পথ অবলম্বন করতে হবে, তাহলো, নিজের মাঝে বিনয় সৃষ্টি করতে হবে। সব সময় মনে রাখতে হবে, গীবত জন্ম নেয় ব্যক্তির মাঝে বিনয় না থাকার কারণে। মানুষ যখন নিজেকে বড় মনে করবে, অহংকারের শিকার হবে তখন সে গীবত করবে। যে ব্যক্তির চোখ নিজের দোষের উপর সে ব্যক্তি তো সব সময় তার সংশোধন নিয়েই ভাববে। অন্যের দোষের দিকে তার তাকানোর সময় কোথায়? তার তো সার্বক্ষণিক চিন্তা হলো, আমার মধ্যে এ দোষ রয়েছে। আমার মধ্যে ওই দোষ রয়েছে। আমাকে আমার দোষগুলো দূর করতে হবে। এর বিপরীতে যদি মনের মধ্যে অহংকার থাকে তখন সে নিজেকে বড় মনে করবে, অন্যকে ছোট জ্ঞান করবে। তার তো নিজেকে নিয়ে ভাবনা নেই; এ কারণে সে অন্যের দোষ খুঁজে বেড়াবে যে, জায়েদের মাঝে ওই দোষ আছে, বকরের মাঝে ওই ত্রুটি আছে। এরপর সে ওই দোষগুলো অন্যদের কাছে বলে বেড়ায়। কাজেই গীবতের মূল উৎস হলো আত্মমুগ্ধতা ও অহংকার। যদি সেই আত্মমুগ্ধতা ও অহংকার নির্মূল হয়ে যায় তাহলে আর তার থেকে গীবত প্রকাশ পাবে না। কাজেই গীবত নির্মূল করার প্রকৃত চিকিৎসা হলো, নিজের ভেতরের অহংকার দূর করে তদস্থলে বিনয় সৃষ্টি করতে হবে।

গীবত করে ফেললে নিজেকে জরিমানা করো:

বিনয়ী হওয়া ও নম্র হওয়া দু'একদিনে হাসিল হয় না। মানুষের চরিত্র ও আচরণ সুন্দর করতে দীর্ঘ সময় ধরে চেষ্টা, মেহনত ও আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন হয়। এজন্য মানুষের উচিত নিজের কথাবার্তা ও আচরণের প্রতি সচেতন হওয়া এবং ভালো মানুষের সান্নিধ্যে থাকা। কাছের শায়েখের নিকট সবক নিতে হবে এবং তাদের সান্নিধ্যে থাকতে হবে। কারণ সৎ ও আদর্শবান মানুষের সাহচর্য মানুষের চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তখন নম্রতা, আদব ও উত্তম আচরণ ধীরে ধীরে অর্জিত হবে ইনশাআল্লাহ।

মানুষের ভেতরে যখন বিনয় ও নম্রতার গুণ সৃষ্টি হয়, তখন সে সহজে অন্যের দোষ নিয়ে আলোচনা করে না এবং কাউকে কষ্ট দেওয়ার থেকেও বিরত থাকে। কিন্তু এই বিনয়ের গুণ অর্জন না হওয়া পর্যন্ত কথা-বার্তা বুঝে শুনে বলতে হবে। কারণ অসতর্ক কথার মাধ্যমেই অনেক সময় মানুষ গীবতের মতো বড় গুনাহে জড়িয়ে পড়ে।

কারো গীবত করে ফেললে নিজের ওপর জরিমানা করতে হবে। অর্থাৎ নিজেকে শাস্তি বা সতর্কতার মধ্যে রাখতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে আবার এমন ভুল না হয়। কেউ যদি অনুভব করে যে সে অন্যের গীবত করেছে, তাহলে তার উচিত সঙ্গে সঙ্গে অনুতপ্ত হওয়া এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া। এজন্য দু'রাকাত তাওবার নামাজ পড়তে হবে। এর মাধ্যমে মানুষ নিজের ভুল উপলব্ধি করতে পারে এবং অন্তরে গীবতের প্রতি ভয় সৃষ্টি হয়।

এভাবে নিয়মিত আত্মসমালোচনা ও নিজের ভুলের জন্য নিজেকে দায়ী করলে ধীরে ধীরে মানুষ গীবতের মতো খারাপ অভ্যাস থেকে দূরে থাকতে পারে। এর দ্বারা ইনশাআল্লাহ এই ব্যাধি দূর হয়ে যাবে এবং মানুষ নিজের জবানকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে।

গীবতের প্রতিবাদ করতে হবে:

অসাক্ষাতে কারো নিন্দা করা একেবারেই হারাম। এ নিন্দা সত্য ও বাস্তব ভিত্তিক হলে তা গীবত, মিথ্যা হলে অপবাদ এবং দু'জনের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলে চোখলখুরী। ইসলামী শরীয়ত এ তিনটি জিনিসকেই হারাম করে দিয়েছে। ইসলামী সমাজে প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে যদি তার সামনে অন্য কোনো ব্যক্তির ওপর

মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হতে থাকে, তাহলে সে যেন চুপ করে তা না শোনে বরং তার প্রতিবাদ করে। আর যদি কোনো বৈধ শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া কারো সত্যিকার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা হতে থাকে, তাহলে এ কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের আল্লাহকে ভয় করতে এবং এ পাপ থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দিতে হবে। নবী সা. বলেছেনঃ

"যদি কোনো ব্যক্তি এমন পরিস্থিতিতে কোনো মুসলমানকে সাহায্য না করে যেখানে তাকে লাঞ্ছিত করা হচ্ছে এবং তার মান-ইজ্জতের ওপর হামলা করা হচ্ছে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে সেসব ক্ষেত্রে সাহায্য করবেন না, যেখানে সে তাঁর সাহায্যের প্রত্যাশা করে। আর যদি কোনো ব্যক্তি এমন পরিস্থিতিতে কোনো মুসলমানকে সাহায্য করে যখন তার মান-ইজ্জতের ওপর হামলা করা হচ্ছে এবং তাকে লাঞ্ছিত ও হেয় করা হচ্ছে তাহলে মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ ও তাকে এমন পরিস্থিতিতে সাহায্য করবেন যখন সে আল্লাহর সাহায্যের প্রত্যাশী হবে।" (আবু দাউদ)

গীবতকারীকে তওবা করতে হবে :

গীবতকারী ব্যক্তি যখনই উপলব্ধি করবে যে, সে এ ঘৃণিত পাপটি করছে অথবা করে ফেলেছে তখন তার প্রথম কর্তব্য হলো আল্লাহর কাছে তওবা করা এবং এ হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা। এরপর তার ওপর দ্বিতীয় যে কর্তব্য বর্তায় তা হচ্ছে, যতদূর সম্ভব এ গোনাহের ক্ষতিপূরণ করা। সে যদি কোনো মৃত ব্যক্তির গীবত করে থাকে তাহলে সে ব্যক্তির মাগফিরাতের জন্য অধিক মাত্রায় দোয়া করবে। যদি কোনো জীবিত ব্যক্তির গীবত করে থাকে এবং তা অসত্যাও হয় তাহলে যাদের সাক্ষাতে সে এ অপবাদ আরোপ করেছিল তাদের সাক্ষাতেই তা প্রত্যাহার করবে। আর যদি সত্য ও বাস্তব বিষয়ে গীবত করে থাকে তাহলে ভবিষ্যতে আর কখনো তার নিন্দাবাদ করবে না। তাছাড়া যার নিন্দাবাদ করেছিল তার কাছে মাফ চেয়ে নেবে। একদল আলেমের মতে, যার গীবত করা হয়েছে সে যদি এ বিষয়ে অবহিত হয়ে থাকে, কেবল তখনই ক্ষমা চাওয়া উচিত। অন্যথায় শুধু তাওবা করলেই চলবে। কারণ, যে ব্যক্তির গীবত করা হয়েছে সে যদি এ বিষয়ে অবহিত না থাকে এবং গীবতকারী তার কাছে গিয়ে বলে, আমি তোমার গীবত করেছিলাম তাহলে তা তার জন্য মনোকষ্টের কারণ হবে।

ভালো বন্ধু ও পরিবেশ নির্বাচন করা :

মানুষ তার বন্ধু ও পরিবেশ দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। ভালো বন্ধু মানুষকে সৎ কাজের দিকে আহ্বান করে, আর খারাপ সঙ্গ মানুষকে গুনাহের দিকে নিয়ে যায়। গীবতের ক্ষেত্রেও এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে পরিবেশে সবসময় অন্যের দোষ আলোচনা, সমালোচনা ও অপমান করা হয়, সেখানে মানুষ অজান্তেই গীবতে জড়িয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে, ভালো ও দ্বীনদার বন্ধু মানুষকে গীবত থেকে বিরত থাকতে সাহায্য করে এবং সুন্দর চরিত্র গঠনে সহায়তা করে।
সুনানে আবু দাউদে রাসূল ﷺ বলেছেন—
"মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের উপর চলে। তাই তোমাদের প্রত্যেকের দেখা উচিত সে কাকে বন্ধু বানাচ্ছে।"
এই হাদীস থেকে বোঝা যায় যে বন্ধুর চরিত্র ও অভ্যাস মানুষের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। যদি বন্ধুদের আড্ডায় সবসময় অন্যের সমালোচনা, হাসাহাসি ও বদনাম করা হয়, তাহলে গীবত স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হতে পারে। কিন্তু ভালো বন্ধু গীবত শুরু হলে বিষয় পরিবর্তন করে, সতর্ক করে এবং অন্যের সম্মান রক্ষা করতে উৎসাহ দেয়।

গীবতের আসর ত্যাগ করা :

গীবত থেকে বাঁচার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো গীবতের আসর বা এমন পরিবেশ ত্যাগ করা, যেখানে মানুষের দোষচর্চা, অপমান ও সমালোচনা করা হয়। অনেক সময় মানুষ নিজে গীবত না করলেও অন্যের গীবত শুনতে শুনতে সেই গুনাহের অংশীদার হয়ে যায়। তাই ইসলামে গীবতের মজলিস থেকে দূরে থাকার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।
গীবতের পরিবেশে উপস্থিত থাকা ধীরে ধীরে মানুষের অন্তরকে প্রভাবিত করে। প্রথমে হয়তো শুধু শোনা হয়, পরে ধীরে ধীরে সে নিজেও সেই আলোচনায় অংশ নিতে শুরু করে। এভাবে অজান্তেই মানুষ গীবতের মতো বড় গুনাহে জড়িয়ে পড়ে। তাই একজন সচেতন মুমিনের উচিত এমন পরিবেশ এড়িয়ে চলা এবং যেখানে মানুষের সম্মান নষ্ট করা হয়, সেখান থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া।
এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

অর্থ : "নিশ্চয় যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা ও কুকথার প্রচার কামনা করে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আল্লাহ জানেন, আর তোমরা জানো না।"

— সূরা আন-নূর ২৪:১৯

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা সমাজে অশ্লীলতা, কুৎসা, অপবাদ ও খারাপ কথা ছড়িয়ে দেওয়ার কঠোর নিন্দা করেছেন। যারা মানুষের দোষ, লজ্জাজনক বিষয় বা অপমানজনক কথা প্রচার করে সমাজে ফিতনা সৃষ্টি করে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিন শাস্তির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

এই আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, শুধু গীবত করা নয়; বরং গীবত বা খারাপ কথা ছড়িয়ে দেওয়া এবং এমন পরিবেশে অংশগ্রহণ করাও অত্যন্ত গুনাহের কাজ। তাই গীবত থেকে বাঁচার জন্য শুধু নিজের জবান নিয়ন্ত্রণ করাই যথেষ্ট নয়; বরং গীবতের আসর ও পরিবেশ থেকেও দূরে থাকা অত্যন্ত জরুরি।

আত্মসমালোচনা ও নিজেকে যাচাই করা :

ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মসমালোচনা একজন মুমিনের চরিত্র গঠনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কারণ যে ব্যক্তি নিজের ভুল খুঁজে বের করে সংশোধন করার চেষ্টা করে, সে ধীরে ধীরে গীবত, অহংকার, হিংসা ও অন্যের দোষ খোঁজা থেকে দূরে থাকতে পারে। আত্মসমালোচনা মানুষের অন্তরকে সচেতন করে এবং তাকে নিজের আমল ও আচরণ সম্পর্কে ভাবতে শেখায়।

মানুষ সাধারণত অন্যের ভুল খুঁজতে বেশি ব্যস্ত থাকে, কিন্তু নিজের দোষ-ত্রুটি নিয়ে চিন্তা করে কম। অথচ একজন সচেতন মুমিন সবসময় নিজের কাজ ও আচরণকে যাচাই করার চেষ্টা করে। সে চিন্তা করে যে, তার কথাবার্তা, আচরণ ও কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির উপযোগী হচ্ছে কি না। এভাবে আত্মসমালোচনার মাধ্যমে মানুষ নিজের দুর্বলতা বুঝতে পারে এবং নিজেকে সংশোধনের সুযোগ পায়।

আত্মসমালোচনা মানুষকে নিজের দিকে ফিরিয়ে আনে। যখন মানুষ নিজের ভুল নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তখন অন্যের গীবত করার প্রবণতা অনেক কমে যায় এবং চরিত্র সুন্দর হয়। কারণ তখন সে বুঝতে পারে যে তার নিজের মাঝেই অনেক দোষ-ত্রুটি রয়েছে।

ফলে অন্যের সমালোচনা করার পরিবর্তে সে নিজেকে সংশোধন করার প্রতি মনোযোগ দেয়।
যে ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে চিন্তা করে যে, "আমার মাঝে এত এত দোষ-ত্রুটি রয়েছে, কিভাবে আমি তা থেকে মুক্তি পেতে পারি"— এ ধরনের চিন্তায় চিন্তিত ব্যক্তি কখনো অন্যের গীবত করার সুযোগ পাবে না। কারণ সে সবসময় নিজের সংশোধন নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। এর ফলে মানুষের অন্তরে বিনয় সৃষ্টি হয় এবং অহংকার কমে যায়।
এছাড়া আত্মসমালোচনা মানুষের চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করে এবং তাকে ভালো কাজের দিকে উৎসাহিত করে। যে ব্যক্তি প্রতিদিন নিজের কাজের হিসাব নেয়, সে সহজেই বুঝতে পারে কোন কাজ তার জন্য উপকারী আর কোন কাজ ক্ষতিকর। তাই গীবতের মতো খারাপ অভ্যাস থেকে বাঁচার জন্য আত্মসমালোচনা ও নিজেকে নিয়মিত যাচাই করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সদাচার্য ও প্রেরনামূলক কথা বলা:

সদাচার্য (ভালো চরিত্র) হলো মানুষের আচরণ, কথা ও ব্যবহারের সেই সৌন্দর্য, যা তাকে সমাজে সম্মানিত করে এবং আল্লাহর নিকট প্রিয় বানায়। একজন মানুষের ইবাদত যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি তার আচার-আচরণ ও কথা বলার ধরনও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মানুষের চরিত্র তার মুখের কথার মাধ্যমেই বেশি প্রকাশ পায়। ভালো কথা বলা, অন্যকে সম্মান করা, সত্য কথা বলা, ধৈর্য রাখা, নম্র আচরণ করা—এসবই সদাচার্যের অন্তর্ভুক্ত।
একজন মানুষ যখন সুন্দরভাবে কথা বলে এবং অন্যের সাথে উত্তম আচরণ করে, তখন তার মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্মান বৃদ্ধি পায়। এর ফলে সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে। বিপরীতে খারাপ কথা, গীবত, অপমান বা কটু মন্তব্য মানুষের সম্পর্ক নষ্ট করে এবং সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে। তাই ইসলামে কথাবার্তার ক্ষেত্রে সর্বদা সতর্ক ও সুন্দর হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

অর্থ : "তোমরা মানুষের সাথে সুন্দরভাবে কথা বলো।"
— সূরা বাকারা ২:৮৩

এই আয়াত মানুষকে সুন্দর ভাষা, কোমল ব্যবহার এবং উত্তম আচরণের শিক্ষা দেয়। ইসলাম এমন একটি জীবনব্যবস্থা যা শুধু ইবাদত নয়, বরং প্রতিটি কথাবার্তা ও আচরণকে সুন্দর করার নির্দেশ দেয়।

খারাপ কথা, অপমান, গীবত বা কটু মন্তব্য ইসলামে নিষিদ্ধ, কারণ এগুলো মানুষের হৃদয়ে আঘাত করে এবং সম্পর্ক নষ্ট করে। আর সুন্দর কথা বলা, প্রেরণামূলক ও ভালো ভাষা ব্যবহার করা একটি নেক আমল, যা মানুষের হৃদয়কে নরম করে এবং সমাজে ভালো পরিবেশ সৃষ্টি করে।

সুতরাং একজন মুসলমানের উচিত সবসময় এমনভাবে কথা বলা, যা অন্যের জন্য কল্যাণকর, নিজের জন্য নেকির কারণ এবং সমাজের জন্য শান্তির মাধ্যম হয়।

জবানের হেফাজত :

হাদিস শরিফে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

"مَنْ ضَمِنَ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমাকে দুটি জিনিসের জামানত দেবে আমি তাকে জান্নাতের জামানত দেব। সেই দুটি জিনিস হলো: ১. দুই ঠোঁটের মাঝখান তথা জবান ২. দুই উরুর মাঝখান তথা যৌনাঙ্গ।

এই হাদীসের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিয়েছেন—জীবনের দুটি অঙ্গকে নিয়ন্ত্রণে রাখা জান্নাত লাভের অন্যতম মাধ্যম। এর মধ্যে জবান হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মানুষের ভালো-মন্দ অনেকটাই তার কথাবার্তার উপর নির্ভর করে। মানুষ এই জবান দিয়েই সত্য কথা বলতে পারে, আবার মিথ্যা, গীবত, অপবাদ ও অশ্লীল কথাও বলতে পারে।

এগুলোকে ভুল পথে ব্যবহার না করলে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার জবানকে সংযত রাখে, মিথ্যা কথা বলা, গীবত করা, কারো সম্মান নষ্ট করা এবং অপ্রয়োজনীয় কথা বলা থেকে বিরত থাকে, তার জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

পক্ষান্তরে যদি জবানের সঠিক ব্যবহার না করে এটাকে ফ্রি মেশিন মনে করে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যথেচ্ছ ব্যবহার করা হয়, তাহলে তা অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়।

অনেক মানুষ চিন্তা না করে কথা বলে ফেলে, যার কারণে অন্যের সম্মান নষ্ট হয় এবং নিজের আমলও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
বরং প্রতিটি মানুষের উচিত চিন্তা-ফিকির করে কথা বলা। মুখ দিয়ে যে সমস্ত কথা বলা হচ্ছে সেগুলো উপকারী না ক্ষতিকারক— তা আগে বিবেচনা করা জরুরি। উপকারী ও ভালো কথা বলা এবং অপ্রয়োজনীয়, ক্ষতিকর ও গীবতপূর্ণ কথা থেকে বিরত থাকা একজন মুমিনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এভাবে জবানকে নিয়ন্ত্রণে রাখলে মানুষ দুনিয়ায় শান্তি পায় এবং আখিরাতেও সফল হতে পারে।

উপসংহার:

গীবত একটি মারাত্মক পাপ, যা শুধু ব্যক্তির আত্মিক ক্ষতিই করে না, বরং সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলাও ধ্বংস করে এবং আখিরাতের কঠিন শাস্তির কারণ হয়। ইসলামের নির্দেশনা অনুযায়ী গীবত মানুষের সম্মান নষ্ট করে, সম্পর্কের মধ্যে বিদ্বেষ ও বিভেদ সৃষ্টি করে এবং নেক আমল নষ্ট করে দেয়। তাই ব্যক্তিগত, সামাজিক ও আখিরাতের ক্ষতির দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভয়াবহ একটি গুনাহ।
গীবতের কারণে মানুষে মানুষে আস্থা কমে যায়, পারস্পরিক ভালোবাসা নষ্ট হয় এবং সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। একটি ছোট গীবতও অনেক সময় বড় বিবাদ, ঝগড়া ও সম্পর্ক ভাঙনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই একজন মুসলমানের জন্য শুধু নিজের ইবাদত নয়, বরং অন্যের অধিকার ও সম্মান রক্ষা করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
অতএব, একজন সচেতন মুসলমানের উচিত গীবত থেকে নিজেকে দূরে রাখা, অন্যের সম্মান রক্ষা করা এবং সুন্দর চরিত্র গঠন করা—যাতে দুনিয়ায় শান্তি এবং আখিরাতে মুক্তি লাভ করা যায়। কারণ ইসলামে মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্মানের মর্যাদা অত্যন্ত পবিত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।
সহীহ মুসলিমে এসেছে, রাসূল ﷺ বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন—
"তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সম্মান তোমাদের জন্য এমনই হারাম (পবিত্র ও সংরক্ষিত), যেমন এই দিন, এই মাস এবং এই শহরটি পবিত্র।"
আর আরেক বর্ণনায় এসেছে—
"প্রত্যেক মুসলিমের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান অন্য মুসলিমের উপর হারাম।"

তাই ইসলামের এই সুস্পষ্ট নির্দেশনা থেকে বোঝা যায় যে, একজন মুসলমানের সম্মান নষ্ট করা বা তার বিরুদ্ধে গীবত করা অত্যন্ত বড় অন্যায়। সুতরাং সকল মুসলমানের জন্য গীবত থেকে বেঁচে থাকা ।